প্রথম প্রকাশ / রথযাত্রা, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ / গ্রন্থকার

প্রচ্ছদ মুদ্রণ / দিলীপ পাত্র, স্টুডিও সেরিগ্রাফ. ৩৯ এস. আর. দাস রোড, কলি-২৬

প্রকাশক / গিরিজা চৌধুরী, ৬২।৩, টালিগঞ্জ রোড, কলি-৩৩

পরিবেশক / পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯

মুদ্রণ / দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৬

সূচী

১.

গম্ভীরা : অর্থ—

'গম্ভীরা' শব্দটির অর্থ খুব সুস্পষ্ট নয়।[১] তবুও আমরা অভিধান অনুসরণ করে শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বা ব্যবহারিক যে অর্থ পাই তাতে দেখা যায় যে ১. গম্ভীরা। বি [গম্ভীর মূল] ১. পুরীধামে কাশী মিশ্রের ভবনে চৈতন্যদেবের বাসস্থান নিভৃত গভীর প্রকোষ্ঠ, অলিন্দের পর দালান, তার ভিতরে ক্ষুদ্র গৃহ। গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব, চৈ, চ ৩১৩, গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ৩৫০/. ২. জগন্নাথদেবের শয়ন মন্দির। 'গম্ভীর গম্ভীরা কক্ষে অন্ধকার অতি : গম্ভীরা কুহরে জ্বলে প্রদীপ সন্ততি, চৈ ১০৩. ৩. গ্রাম্য দেবতার স্থান (দিনাজপুর) ৪. শিবের মন্দির ; গাজন ঘর ; গাজন উৎসব।'[২] অভিধানকারকে অনুসরণ করে এই ধারণা করা যেতে পারে যে গম্ভীরা শব্দে বাড়ীর অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বোঝায়। অন্ততঃ চৈতন্য যুগে তা বুঝতে অসুবিধে হতো না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গম্ভীরা পূজা বা উৎসবের ক্ষেত্রে গৃহ বা মন্দির অথবা তাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের কোন সম্পর্ক নেই। গম্ভীরা সম্পর্কে প্রথম গবেষক অবশ্য শিব-মন্দির হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন 'গম্ভীরা' শব্দটি।[৩] কিন্তু আসলে মন্দিরের সঙ্গে এ শিবের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ আজও এই পূজা বা উৎসব উন্মুক্ত আকাশের নীচেই অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও বা চাঁদোয়া অথবা ত্রিপল ইত্যাদি দিয়ে ঢাকে, কিন্তু অন্যান্য লোক-দেবতার পূজার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এই বিষয়ে এর পূর্ণাঙ্গ মিল দেখা যায়।

আজকের গম্ভীরা পূজা-উৎসব, নৃত্য-গীত প্রভৃতির সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিবের মূর্তি স্থাপন করে পূজা, গাজন ইত্যাদি শিব অনুসঙ্গী সব কিছুই এই গম্ভীরার অন্তর্গত। আলোচনা ও বিচার করে আমরা দেখাতে সচেষ্ট যে এই শিব প্রকৃত পক্ষে কে? তাঁর স্বরূপ বৈশিষ্ট্যই বা কি? সমগ্র পূজা ও উৎসবাদির উৎস কোথায়?

বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা-পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য অনুসন্ধান করে তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করতে হবে।

প্রাচীনকালে তো বটেই, আজও গম্ভীরা উৎসব-পূজা, গীত-নৃত্যাদিতে 'পৌণ্ড্রক বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়গণের উৎসাহাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। নাগর, ধানুক, চাঁই, রাজবংশীদের মধ্যেই গম্ভীরার ব্যাপক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এ বিষয়ে দীর্ঘ ষোল বছর স্থানীয়ভাবে মালদহ জেলার প্রতিটি থানায় অনুসন্ধান করে প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্র থেকে যে তথ্য পেয়েছি, তাতে দেখা যায় যে অ-বর্ণহিন্দু (Non-caste Hindu) সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবর্ণের হিন্দু, অর্ধ-আদিবাসী ও আদিবাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে গম্ভীরার অনুষ্ঠানাদির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। ইদানীংকালে ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি এই উৎসব-পূজায় কোন কোন ক্ষেত্রে যোগদান করলেও তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। শতকরা এক ভাগও তাঁরা নন। আমাদের একটা পরিসংখ্যানে ইংরেজবাজার থানার বালুপুর, মহজমাপুর, কর্মনীগ্রাম, চণ্ডীপুর, দিলালপুর, নিত্যানন্দপুর, সদানন্দপুর, জ্ঞানপাড়া, শ্রীরামপুর, দামোদরপুর, খাসকোল, ভর্তৃটারী, মাদিয়া, মথুরাপুর, ভাগলপুব, রাধামাধবপুর, কান্তনগর, রামেশ্বরপুর, কাজীগ্রাম, জগদীশবাটী, বরমপুর, দক্ষিণ চণ্ডীপুর, কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুর, হবিবপুর থানার হবিবপুর, জগদলা, রতুয়া থানার খৈলসনা, মানিকচক থানার নওবরার জায়গীর, গাজোল থানার দহিল, বামনগোলা থানার ফরিদপুর, বেরুল, সিমলা ও বাশড়া গ্রামের মুখ্য অধিবাসীবৃন্দ নাগর, বিন্দ্, কাহার, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, ছুতার, মাহিষ্য, কৈবর্ত, তাঁতী, দেশী চামার, কুম্ভকার, কেওট, বিন্দ, চাঁই (মণ্ডল), পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, নাগর (মণ্ডল) রাজবংশী, বাগ্দী, জেলে, বৈশ্য, কুরমী, নুনিয়া, বনিক, হাঁড়ী, সাঁওতাল, ধোপা, মাহ্লী, বেদিয়া, সদ্গোপ, চামার, রবিদাস ও তুরী। কিন্তু গম্ভীরার মুখ্য অংশ-গ্রহণকারীগণ নাগর, কেউট, কাহার, গোয়ালা, জেলে, তাঁতী, বিন্দ, ধোপা, নাপিত ও রাজবংশী। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে রাজবংশীরাই সর্বাপেক্ষা বেশী এ পূজায় অংশগ্রহণ করে।

মালদহ যে ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে অবস্থিত তাকে এই প্রসঙ্গে সামান্য ব্যাখ্যা করে নিলে ভাল হয়। কারণ নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে এর মুখ্য অংশগ্রহণ-কারীরা এই পূজা ও উৎসবের সঙ্গে কি ভাবে যুক্ত তাও দেখা প্রয়োজন। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই অঞ্চল সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গ বা বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। *এটি প্রধানতঃ মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, রংপুর, রাজশাহী,* পাবনা ও বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের উত্তরাংশ প্রধানতঃ কোচ জাতিদ্বারা অধ্যুষিত। কোচজাতি ভারতের এক অতি প্রাচীন আদিবাসী।

রাঢ় অঞ্চলের যে আদিবাসী সমাজ ক্রমে হিন্দুভাবাপন্ন হয়েছে, তার সঙ্গে কোচ জাতির মৌলিক পার্থক্য আছে। রাঢ় দেশীয় আদিম অধিবাসী মুখ্যতঃ আদি অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জনগোষ্ঠিভুক্ত। কিন্তু উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসী ইন্দো-মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীভুক্ত। এরা কিন্তু পীত নয়, বরং কৃষ্ণবর্ণ[৪] যদিও এরই পাশাপাশি পলিয়াদের চেহারায় পরিষ্কার ইন্দোমঙ্গোলয়েড ছাপ বর্তমান। এর সমর্থনে রিজলি সাহেবও বলেছেন—Kochh, K·chh-Mondal, Rajbansi, Paliya, Desi, a large Dravidian tribe of North Eastern and Eastern Bengal, among whom there are grounds for suspecting some admixture of Mongolian blood.[৫]

প্রসঙ্গক্রমে তাদের ধর্মসম্পর্কে বলা যায় যে মূলতঃ শৈব হলেও শক্তি, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও তন্ত্র—এই চার ধারা অদ্ভুতভাবে তাদের ধর্মের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কোচ, ধীমাল ও মেচ—এই তিন উপজাতির মধ্যেই আর্য ও প্রাগার্য শিবের প্রভাব বর্তমান।

কিন্তু অবিভক্ত মালদহ জেলাতেই কেবল গম্ভীরাপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের দু' চারটি শিবপূজা এখনও গম্ভীরা পূজা নামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু এটি কেবলমাত্র পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রভাবমাত্র। মালদহ জেলাতে এটি জাতীয় উৎসব হিসেবে গণ্য, সুতরাং মালদহ জেলাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আলোচনা।

মালদহের গম্ভীরার শিবে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপারটি উত্তর দিক হতে দক্ষিণে প্রসারিত সূত্রেরই ফলশ্রুতি। আমাদের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখা যায় যে পরিপূর্ণভাবে কোচ ও রাজবংশীদের দ্বারা কেবল মাত্র তিনটি গম্ভীরা পূজা এখনও হয়ে থাকে।

আদিবাসী কোচপালের পূজা গম্ভীরায় প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে প্রয়াত গবেষক হরিদাস পালিত আদ্যশিবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। লোকমতকে তিনি স্বীকার করে নিয়েও এটিকে শিবের পূজা বলে স্থির করেছেন।[৬] আজ গম্ভীরা এক ধরণের লৌকিক শিবপূজা বটে, কিন্তু আদিতে তিনি শিব নন। শিবকে যুক্ত করার তাগিদে পালিত মশায় 'আদ্যের গম্ভীরা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। অবিভক্ত মালদহ জেলায় কোথাও 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে কথা শুনিনি। আসলে এর প্রধান অংশগ্রহণকারীদের ধর্মের মধ্যে গম্ভীরার কোন বীজ আছে কিনা তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বামনগোলা থানার

জগদলা অঞ্চলে বিশিষ্ট গম্ভীরা-উৎসবে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য করার চিত্র আজও আদিম ধর্মানুষ্ঠানের কথা যেমন মনে পড়িয়ে দেয়, তেমনি জাদুবিদ্যা ও তন্ত্রের প্রভাবও লক্ষ্যনীয়।[৭] ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শব্দটিকে উপজাতীয় বলে অনুমান করেছেন।[৮] উত্তর বাংলার সংস্কৃতির উপকরণ সাধারণতঃ উত্তরদিক দিক থেকে দক্ষিণে প্রসারিত (কেবল তন্ত্রধর্ম গৌড় থেকে উত্তরে প্রসারিত)। জলপাইগুড়ির গমীরা শব্দটি ক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের বশবর্তী হয়ে গম্ভীরায় পরিণত হয়ে থাকবে। গম্ভীরা শব্দ থেকে গমীরার উৎপত্তি হয় নি, এটি কি সত্য ? গমীরা ও গম্ভীরার মধ্যে গানের ঢঙ ও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের যে পার্থক্য তা কিন্তু ভাববার বিষয়। মালদহের গম্ভীরা বিদ্রূপাত্মক। খণ্ড পালাগানের অন্তর্ভূত, কিন্তু জলপাইগুড়ির গমীরা নৃত্যবিহীন একক গান। গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য আবার গম্ভীরা গানের অগ্রজ এবং তার মধ্যেই তার গোত্র লুকিয়ে আছে তা তো অস্বীকার করার নেই। গামারের কথাও অন্যত্র উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধেয় আচার্য।[৯] সংস্কৃত গম্ভারী (যার উদ্ভিদবিদ্যার নাম Gmelina arborea) তা ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। গামারি মঙ্গলে চলিল ভকতাগণে, বা শ্রীধর্মমঙ্গলে আছে— 'গামারের পীড়ি।'' ৩১, আছে গম্ভীরা শব্দটি ৮২. কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও আছে— কাটিল গম্ভারি, ক. চ ৭৭। রাজবংশীরা ধর্মঠাকুরের পূজা করে। এটি আদতে সূর্যপূজা। ধর্মঠাকুরের পূজায় গামার কাঠের পীড়ি বা দোলা ব্যবহৃত হত[১০] এবং কোন সময় সেই পীড়িকেই হয়ত ধর্ম বলে পূজা করা হত, তাই গম্ভারী থেকে গম্ভীরা এসেছে এ কথা মনে করা যেতে পারে।

গম্ভীরার শিবগড়ার বন্দনায় শূন্যপুরাণের ধর্ম ঠাকুরের উল্লেখ মেলে। কয়েকটি গান নীচে দেওয়া হলো—

১. কোথা হৈতে আইলেন গোঁসাই, কোথায় তোমার স্থিতি,
আহার নাই, পানি নাই, আইসো নিতি নিতি।
জল নাই, স্থল নাই, সকল শূন্যাকার
কর্পূরেতে ভর কর পবন আহার।
……শিবনাথ কি মহেশ।

২. পৃথিবীর জন্মকথা—
নাই ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল
কোনরূপে ছিল ধর্ম হয়ে শূন্যাকার।
কাঁকড়াকে পাঠালেন মৃত্তিকার তলে।

কাঁকড়া আনিল মৃত্তিকা বিন্দু পরিমাণ।

বিন্দু পরিমাণ মধ্যে তিল পরিমাণ

তিল পরিমাণ মধ্যে বেল পরিমাণ

কূর্মের পৃষ্ঠে পৃথিবী করিল স্বজন

কহনত গুরু গোঁসাই সরস্বতীর বরে।

পৃথিবীর জন্মকথা কহি সবার ভিতরে...শিবনাথ কি মহেশ।

৩. উল্লুকে বলে গুরু এই রে কারণ

গুরুর বচনে শুদ্ধ মন্দিরের চারিকোণ ॥

মন্দিরে বসিল গুরু দেবরাজ মন।

গুরুর বচনে শুদ্ধ দেবরাজ মন ॥...শিবনাথ কি মহেশ

[গিলাবাড়ী গম্ভীরা]

৪. কাউসেন দত্তের ব্যাটা নয়নসেন দত্ত

যে জন আনিলা পৃথিবীতে মহেশ্বরব্রত

তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ শত শত

শিব বসাইয়া দিল গম্ভীরা ভিতরে

শিব বালাভক্তগণ সবে নৃত্য করে।...শিবনাথ কি মহেশ[১১]

[ভোলাহাট গম্ভীরা]

আসলে এই শূন্যমূর্ত্তির পূজা সূর্যপূজারই নামান্তর। প্রয়াত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধদের শূন্যবাদকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লোকশ্রুতিবিদ ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য এই শূন্যপূজাকে সূর্যেরই পূজা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। 'শূন্য মূর্তির অর্থ Cipher বা Circular Shaped বা গোলাকৃতি, ইহা সূর্যেরই একটি গুণ, বৌদ্ধধর্মের কিছু নহে। এই অর্থেই শব্দটি 'ধর্মপূজাবিধান' নামক গ্রন্থেও গৃহীত। ধর্মঠাকুরের বন্দনায় আছে—

মণ্ডলং বর্তুলাকারং শূন্যদেহং মহাবলম্

একচক্রধরং দেবং তং সূর্যং প্রণমাম্যহম্।

এখানে শূন্যদেহকেই সূর্য বলা হয়েছে, অতএব শূন্য মূর্তিও যে সূর্য সে বিষয়ে সংশয় করার কোন কারণ নেই।'[১২]

এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে মালদহের গম্ভীরা পূজা বৎসরে শেষ দিনেই অনুষ্ঠিত হতো বা হওয়ার কথা, যদিও নরনারীদের উৎসব ও পূজায় যোগদানের সুবিধের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। তা কিন্তু পরবর্তীকালের

যোজনা। সুতরাং প্রধান দিন ঐ চৈত্র সংক্রান্তি। ঐ দিনটিতে চড়কও অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক যে সূর্যোৎসব তা স্বীকৃত সত্য।

অতএব সূর্যপূজা পরবর্তী পর্যায়ে শৈব ধর্মের প্রভাবে আদিবাসীদের হাতে গম্ভীরা নাম নিয়েছে—একথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে বলে আমাদের ধারণা। গৌড়ের দ্বিতীয় ধর্মপালদেব ও গোবিন্দচন্দ্র দেবের আমলে রাজ্যমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপের ন্যায় এক প্রকার পূজাগৃহ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হত, তার নাম গম্ভীরা।[১৩] আরও একটা কথা—বাংলার যশোহর-খুলনা অঞ্চলে গাজনের শিবের ঘরকে কোথাও কোথাও 'গম্ভীর ঘর' বলা হয়। সুতরাং শৈব প্রভাবে এই শিবপূজা গম্ভীরা পূজায় নাম নিয়েছে একথাও মেনে নেওয়া যেতে পারে।

গম্ভীরা পূজা ও উৎসব-

ক. পূজা ও উৎসবের সীমানা

অবিভক্ত মালদহের প্রায় সব থানাতেই গম্ভীরা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যাটক্লিফ রোয়েদাদে ভোলাহাট, গোমস্তাপুর, শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও নাচোল পূর্ব পাকিস্তানের [বর্তমান বাংলাদেশ] অন্তর্গত। আমরা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত মালদহ জেলার দশটি থানাকে (ইংরেজবাজার, মালদহ, গাজোল, বামনগোলা, হবিবপুর, রতুয়া, মানিকচক, কালিয়াচক, খরবা ও হরিশ্চন্দ্রপুর) নিয়ে আলোচনা করছি, কারণ গম্ভীরার পূর্ণরূপ এগুলির মধ্যেই ধরা পড়বে।

অর্থনৈতিক সংকটে গম্ভীরাপূজার সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। পরিসংখ্যানে আমরা দেখেছি যে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় গম্ভীরা পূজার খবর পাওয়া যায় নি। পূর্বে কয়েকটি গ্রামে সাড়ম্বরে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। বছর ত্রিশ আগেও বাংলার জাতীয় উৎসব দুর্গোৎসবের ন্যায় মালদহ গম্ভীরা পূজায় নতুন জামাকাপড় কেনা ও পরার ধুম পড়ে যেত। গম্ভীরা পূজায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আগেকার দিনে বর্তমান ছিল। এখনও গম্ভীরা উৎসব চলে বটে, কিন্তু গম্ভীরা সঙ্গীতেরই প্রাধান্য বেশী। এ গীত এখন স্থান কাল মানে না, তাই আগের গম্ভীরা গীতের চেয়ে আজকের গম্ভীরাপূজা বিহীন গীতে সার্বজনীনতার ছাপ বেশী। ভোলাহাট, আইহো, মহদীপুর, কুতুবপুর, কোতেয়ালী, মহেশপুর, কাশিমপুর, গণিপুর, জোত, আরাপুর, মুকদমপুর, পুরাটুলি, ইংরেজবাজার, গয়েশপুর, পুরাতন মালদহ, ধানতলা, মঙ্গলবাড়ী, গিলাবাড়ী ও সাহাপুরের গম্ভীরা উৎসব এককালে বিখ্যাত ছিল। তবে এ উৎসবের পীঠস্থান বলতে ভোলাহাট, আইহো, মহদীপুর, জোত, আরাপুর, সাহাপুর, পুরাতন মালদহ ও শিবগঞ্জকেই বোঝায়।

বর্তমান কালের থানাভিত্তিক প্রধান প্রধান গম্ভীরা পূজার একটা পরিসংখ্যান আমরা নীচে দিলাম—

১. ইংরেজবাজার—সেকেন্দারপুর, ফুলবাড়িয়া, মোহনপাড়া, অমৃতি, জগদীশবাটী, বাসুদেবপুর, বারঘড়িয়া, খাসকোল, মবারকপুর, মাদাপুর, কাজীগ্রাম, মথুরাপুর, নিয়ামতপুর, হরিশপুর, ভর্তৃটারি, আনন্দমোহনপুর, জোতগোকুল, জোতবসন্ত, ডারসাল্লা, নিমাসরাই, সাট্টারি, রামেশ্বরপুর, ভাগলপুর, জোতপৃথ্বী, কান্তনগর, ফতেপুর, মাদিয়া, রাধামাধবপুর, দিলালপুর, নিত্যানন্দপুর, সদানন্দপুর, জ্ঞানপাড়া, শ্রীরামপুর, দামোদরপুর, গোঁসাইপুর, বরমপুর, লালাপুর, বিনোদপুর, দক্ষিণচণ্ডীপুর, বালুপুর, মহদীপুর, আরাপুর, জোত, কোতয়ালী, টিপাজানি, মিলকি, ধানতলা, গণিপুর, দৈবকীপুর, গোকুলনগর কামাত, শৈলপুর, মাধবনগর, মুকদমপুর, অভিরামপুর, ফুলবাড়ী, পুরাটুলি, হাটখোলা, বিবিগ্রাম, বাঁশবাড়ী, কুতুবপুর, নরহাট্টা,, গোবিন্দপুর, শাহজালালপুর, চণ্ডীপুর, গোঁসাইপুর, কর্মণীগ্রাম, মহেশপুব; মহ্‌জমাপুর, বৈদ্যনাথপুর, জোতগঞ্জ, গণিপুর, গয়েশপুর,

২. কালিয়াচক — চরিঅনন্তপুর, আলিপুর, জালালপুর, গোলাপগঞ্জ, রামনগর, পুরাটোলি, মীরগ্রাম, ঠাকুরপাড়া, ভোলাটোলা, মোহনপুর, জোত অনন্ত, শিবনারায়ণপুর, সাদীপুর, শশানি, সবদলপুর, কদমতলা, জালুয়াবাথাল, বালুটোলা, ডোমাইচক, দুর্লভপুর, আকন্দবাড়িয়া, মহাদেবপুর, বালুয়াচাঁড়া, সাহাবাজপুর,

৩. মালদহ / মুচিয়া, মহাদেবপুর, পুরাতন মালদহ, বাচামারি, মঙ্গলবাড়ী, সাহাপুর

৪. হবিবপুর / আইহো, জোতগোকুল, লালপুর-বোদরা, হবিবপুর, খোঁচা-কাঁদর

৫. রতুয়া / সিমলা, খৈলসনা, বড়কোল, সুদামটোলা, শ্রীকান্তটোলা, আমীরচাঁদটোলা, মাধবটোলা,

৬. মানিকচক / কৃষ্ণনগর, নওবরার জায়গীর, উৎসবটোলা, হিলসা-মারি, কালিটোলা,

৭. গাজোল / দহিল, কাস্তোর, মহেশপুর, লক্ষ্মীপুর, গণেশবাটি, সোনাপুর, ভক্তিপুর, শাবল, ভাদর, ইদাম,

৮. বামনগোলা / ফরিদপুর, বেরুল, বামনগোলা, বাশড়া, সিমলা, জগদলা

৯ খরবা / বোয়ালিয়া, ক্ষেমপুর,

বিভক্ত মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি গম্ভীরা পূজারও খবর নেই। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে কোন কোন গ্রামে একাধিক গম্ভীরা পূজাও হয়ে থাকে। ইংরেজবাজার সহরাঞ্চলে ২৩টি, আইহো গ্রামে ১৭টি ও পুরাতন মালদহে ৮টি পূজা হয়েছে ১৯৭৮ সালে। ইংরেজবাজার পৌর অঞ্চলকে মোট পাঁচটি এলাকায় ভাগ করলে এমন দাঁড়ায়—

১. পুরাটুলি— জামতলি, পুরাটুলি, ব্যায়াম সমিতি,

২. মুকদমপুব-অভিরামপুর / বারোয়ারীতলা, তেলিপাড়া, দত্তপাড়া, বাগুলিতলা, অভিরামপুর

৩. ইংরেজবাজার (মূল)—গোয়ালপাড়া, মালোপাড়া, ধোপাপাড়া, বুড়াকালীতলা, হীরা ঘোষের গম্ভীরা, সতীশ সেনগুপ্তের গম্ভীরা

৪. ফুলবাড়ী-কুতবপুব / দুর্গাবাড়ী, মিস্ত্রীপাড়া, পাকুড়তলি, ফুলবাড়ী, বাবুটোলা

৫. বাঁশবাড়ী এলাকায় ৪টি।

পুবাতন মালদহে—কাটরাবাজারে গোয়ালিনী পাড়া, পুরাতন বাজারের খোদ শর্বরীতে ঠাকুরবাড়ীর গম্ভীরা, পিরোজপুর, তারাপুর, মোকাতিপুব, তেলিপাড়া শর্বরীর আগরওয়ালা পাড়া ও শর্বরীর রাধাবল্লভ ঠাকুরবাড়ীর নিকটের গম্ভীরা,

আইহো— হাটখোলা, কামারপাড়া, নামোটোলা, আদর্শ গম্ভীরা, মালোপাড়া ছত্রিশী গম্ভীরা, ঠাকুরপাড়া, ধূলোউড়ি, কুমারপাড়া, মঠ, রতিরাম-পাড়ার নবীন সংঘ, চাঁদপাড়া, যাদবনগরের টিনের গম্ভীরা, বাগুলীতলা, সিংহবাহিনীতলা, যাদবনগর বেলতলা।

মালদহ জেলার উত্তর-দক্ষিণের দুই জেলা অর্থাৎ পশ্চিম দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায়ও গম্ভীরার যে প্রভাব পড়েনি তা নয়। সেখানেও দু'চারটি

শিবপূজা গম্ভীরা নামেই অনুষ্ঠিত হয়। আসলে পার্শ্ববর্তী জেলা হওয়ায় তার প্রভাব পড়া নিতান্ত স্বাভাবিক এবং সেই স্বাভাবিকতার সূত্র ধরেই এই অনুষ্ঠান-গুলি। তবে এদিক থেকে মুর্শিদাবাদ জেলা অপেক্ষা পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় এর প্রভাব অধিকতর বেশী। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার সিংরাইল, বেলবাড়ী, তপন থানার রাজেশ্বরপুর, আজমতপুর, রামচন্দ্রপুর, বাগুরিয়া, তেলিঘাটা, ধাইনগর, বংশীহারী থানার পুরিয়া ও দানগ্রামে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার মণ্ডলপুর গ্রামের শিবপূজা গম্ভীরাপূজা নামে পরিচিত।

অতএব এই সীমানা ধরে অনুসন্ধান করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে যুক্ত বাংলার অন্তর্গত গঙ্গার উত্তরাংশের সামান্য কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জন সহ অঞ্চলগুলির মধ্যে গম্ভীরা পূজা ও উৎসবের প্রচলন আছে যার কেন্দ্রে রয়েছে অবিভক্ত মালদহ জেলা।

খ. গম্ভীরা মণ্ডপ

প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে অর্থাৎ বাংলাব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও গম্ভীরা মণ্ডপ যে ভাবে সাজানো হতো আজ আর সে রকম হয় না। তার কারণ মুলতঃ দুটি। ১. অর্থনৈতিক সংকট ২. সামাজিক পটপরিবর্ত্তন। সে গ্রামীন গৌরব আজ অস্তমিত, তবুও অনুসন্ধানে তখনকার দিনের একটা চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

তখনকার মণ্ডপশ্রী বড়ই মনোরম। সতেজ পদ্মফুলে গম্ভীরা মণ্ডপ সাজানো হত। ঘৃতের প্রদীপ জ্বলতো এবং সর্বদা ধূপ-ধুনার গন্ধে সমস্ত গম্ভীরা মণ্ডপ পূর্ণ থাকতো। কোন কোন স্থানে সরায় সরষে তেল দিয়ে সলতে বা পুঁটুলি জ্বলতো। এ ছাড়া নানা জিনিস দিয়ে হত মশাল তৈরী। উজ্জ্বল আলো থাকতো সমগ্র স্থানটিতে। গায়ক ও নৃত্যবিদেরা মশাল হাতে করেই এক 'গম্ভীরা' থেকে অন্য 'গম্ভীরা'য় যাতায়াত করতো। দর্শকদের বসার কোন আসন ছিল না প্রথম যুগে। নিজেরাই আসন বাড়ী থেকে আনত। উন্মুক্তস্থানে বিরাট চাঁদোয়া দিয়ে গম্ভীরা মণ্ডপ প্রথমে আচ্ছাদিত থাকতো। বড় বড় পিলসুজ বা দেরখো থাকত স্থানে স্থানে যা থেকে চমৎকার আলো হত। কোন

কোন স্থানে মণ্ডপের চারদিকে চারটি বৃহৎ লোহার পিলসুজে বড় চারটি প্রদীপ সারাক্ষণ জ্বলতে দেখা যেত। মৃত্তিকাচর্চিত রামকেলী বস্ত্রেও গম্ভীরা মণ্ডপ শোভা পেত। এই সব বস্ত্রে অলংকরণ (Decoration) করা থাকত। ঝাড় দেয়ালগির, লণ্ঠন, আয়না প্রভৃতিও সেখানে থাকত। মোটা মোমবাতি এবং নানান ধরণের পটও চারদিকে ঝুলত। রাজা রবিবর্মার ছবি, বৌবাজার আর্ট ষ্টুডিওর নানা ছাপা ছবি এমন কি কালীঘাটের পটও শোভা পেত কোথাও কোথাও এই সব পূজামণ্ডপে[১]।

কাগজের বিভিন্ন রঙের পত্রপুষ্পদ্বারা গম্ভীরা মণ্ডপ সজ্জিত হওয়ার কারণও আছে। এই প্রথা প্রাচীন কাল থেকেই ছিল প্রচলিত। ধর্মের গাজনে আদ্যের 'দেহারা' পত্র-পুষ্প দ্বারা শোভিত হত। মাণিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গলে' ধর্ম পদ্ম পুষ্প সৃষ্টি করে তাতে উপবেশন করেছিলেন—

'সম্মুখে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল
তাতে বসিঞা গোঁসাই জপে আদ্যমূল ॥[২]

মাণিকরাম গাঙ্গুলীর 'শ্রীধর্মমঙ্গল'-এও এর স্মৃতি বর্তমান—

প্রফুল্ল হইয়া আছে পদ্মশতদল ! ৬৬
তোয়ে নেমে তামরস তুলিলাম কতি ॥ ৬৮
ধ্যান করি তখন ধর্মায় নমঃ বলে।
সেই পদ্ম অপার সলিলে দিলাম ফেলে ॥ ৭৫[৩]

প্রাচীনকালে সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের দ্বারা গম্ভীরা মণ্ডপ হত সজ্জিত। কিন্তু ইদানীংকালে তার অভাব ও ব্যাপক চাহিদার জন্য কাগজের পুষ্প দ্বারাই সজ্জিত হয় মণ্ডপ। এতদিন নূতন পদ্ম ব্যবহার করার সমাধান কাগজের পুষ্প অনেকখানি সমাধা করেছে।[৪] যদিও তার জৌলুস অনেকখানি অন্তর্হিত।

পরবর্তীকালে এবং এখনও কেরোসিনের লণ্ঠন, বেলোয়ারী ঝাড়, নানা রঙের কাগজের মালা, ফুল, মাটির পহরী (পরী), নানান ধরণের মাটির পুতুল দিয়েও সজ্জিত হয় মণ্ডপ। এখন টিন, ত্রিপল বা ছোট চাঁদোয়া (যেহেতু বড় চাঁদোয়া আজ বিশেষ দেখা যায় না) ইত্যাদি দিয়েও গম্ভীরা মণ্ডপ আচ্ছাদিত হয়। কোথাও পাকা টিন বা টালি দিয়ে তৈরী মণ্ডপ আছে বটে, কিন্তু পূজা ও উৎসবের সামনে আচ্ছাদনের রেওয়াজ এখনও চলছে।

আজকের গম্ভীরা মণ্ডপের সে জিনিস আর নেই, তবুও কাগজের ফুল ইত্যাদি দিয়ে সাজানর রীতি মোটামুটি চলছে। আগেকার মণ্ডপ সাজানর সবচেয়ে

জাঁকজমক খবর আছে ভোলাহাটের মণ্ডপগুলির। সেখানে ছয় থেকে দশ হাজার টাকা খরচ হত। এখনকার খরচ পাঁচশত থেকে দেড় হাজার পর্য্যন্ত।

এবার দেবমূর্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। সুরুতে দেবমূর্তি ছিল না। তবে পরবর্তী পর্যায়ে এবং এখনও গম্ভীরার দেবমূর্তি শিব। তিনি কখনও দণ্ডায়মান, কখনও উপবিষ্ট। তাঁর চার হাত নয়, দু হাত। ব্যাঘ্র-চর্ম পরিহিত ত্রিশূলধারী ফণিভূষণ। এ মূর্তি শাস্ত্রীয় উপাখ্যান অবলম্বনে নির্মিত।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে গম্ভীরা মণ্ডপের অলংকরণের কথা। মাটি, শোলা ও মোম নির্মিত ফল-ফুলের পূর্ণ অনুকরণ করা হত। কাগজের দ্বারা মণ্ডপের ঝালর তৈরী হত। ছেনী দ্বারা কাগজ বিবিধ প্রকারে ছিদ্র করে ঐ ঝালরগুলো প্রস্তুত করা হত। এগুলো দেখতেও ছিল অতি মনোরম। প্রাচীন-কালের এই বিশিষ্ট শিল্পকলা আজ মুমূর্ষু। তবুও আইহো, মহদীপুর ইত্যাদি গ্রামে কিঞ্চিৎ তার পূর্ব ঐতিহ্য চলে আসছে। ভোলাহাটের আশ্চর্যপূর্ণ মণ্ডপের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁতীরাও এই সময়ে নূতন নক্সাযুক্ত কাপড় তৈরী করতো, কারণ সারা বছরের বিক্রির মোট পরিমাণ এই একটি মাসেই হত।

গ. গম্ভীরা ও গ্রাম্য প্রধান : মণ্ডল

প্রায় সত্তর/আশি বছর আগে এক একজন দলপতি থাকতেন প্রতি গ্রামে—এখনকার অনেকটা পঞ্চায়েত প্রধানের মত। সেই গ্রাম প্রধানকে বলা হত মণ্ডল। এই প্রধান বিচক্ষণ লোকটির মতামত সকলেই নির্বিবাদে মেনে নিত। সে সময়ে প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে এক একটি গম্ভীরা থাকত। আসলে এটি মালদহ অঞ্চলের জাতীয় উৎসব বলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানও মণ্ডলের তদারকীতে হত। এক এক গোষ্ঠীর এক একটি গম্ভীরা। মালদহে যত 'গম্ভীরা' বর্তমান, তার মধ্যে আদিতম গম্ভীরার নাম 'ছত্রিশী গম্ভীরা'। ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকলেও ছত্রিশী গম্ভীরার মণ্ডলের বা প্রধানের পদ একজনের উপরেই থাকত। ছত্রিশটি গম্ভীরা না হলেও কোথাও কোথাও সেই নাম আজও চলছে—যেমন হবিবপুর থানার আইহো গ্রামের সতেরোটি গম্ভীরা পূজার মধ্যে একটির নাম 'ছত্রিশী গম্ভীরা।' ছিল আগের দিনে 'বাইশী'ও।

মালদহে 'বাইশ' শব্দ এখনও প্রচলিত। বিন্দ্ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'বাইশী' ও 'চৌরাশী' কথাটির অর্থও বহু। বর্তমানে কম সংখ্যক মণ্ডল নিয়ে গঠিত হলেও এই পঞ্চায়েতের নাম বাইশী। এমন কি 'It appears that the term baisi is even occasionally to designate a single prominent mondal.[১]

মধ্যযুগে বহু অর্থে বাইশ বা সংক্ষেপে বাইশা কথাটি প্রচলিত ছিল। কাজির আদেশে হরিদাসকে 'বাইশ বাজারে' নিয়ে প্রহার করা হয়েছিল। বাইশ বাজার শব্দটি বহু অর্থবাচক।[২]

বহুকাল আগে জমিদার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে গম্ভীরার আয় হত। পরবর্তী সময়ে বা এখন প্রায় সব গম্ভীরাই সার্বজনীন।

মণ্ডলের মধ্যে বিবাদের ফলে পরবর্তী পর্যায়ে মণ্ডল যায় ভেঙ্গে। তাতে দুই বা ততোধিক গম্ভীরাপূজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তাতে দেখা যায় একই গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি গম্ভীরা উৎসব সুরু হতে লাগল। গ্রামীন সমাজের কাঠামোর রূপান্তর হওয়ায় সব কিছুর সঙ্গে এই পূজা-উৎসবের হল পরিবর্তন—দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ বিশেষ করে স্বাধীনোত্তর যুগে।

---

১. Bengal District Gazetteer, Malda, 1921, P. 32

২. ভট্টাচার্য আশুতোষ—বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা (ক. বি) পৃ—৩ দশ,

অনুষ্ঠান পরিচিতি

গম্ভীরা উৎসব আদিতে ছিল চারদিনের। কোন কোন স্থানে তিনদিনের কারণ সেখানে প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটি হয় না। অধুনা একদিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত এ পূজা ও উৎসবের প্রচলন দেখা যায়।

১. প্রথম দিন – ঘটভরা

২. দ্বিতীয় দিন—ছোট তামাসা

৩. তৃতীয় দিন—বড় তামাসা

৪. চতুর্থ দিন—আহারা, বোলবাই বা বোলাই।

চৈত্র সংক্রান্তিতে হয় চড়কপূজা। সে দিনটির আগের চারদিন গম্ভীরা পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে। অবশ্য এখন এক এক অঞ্চলে এক এক তারিখ নির্দিষ্ট আছে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এমন কি শ্রাবণ-ভাদ্র মাসেও গম্ভীরা পূজা হতে দেখা যায়। এমন কি একই গ্রামে তিন চারটি গম্ভীরা মণ্ডপে স্বতন্ত্র তারিখ নির্দিষ্ট আছে। আসলে এটি সারা মালদহ জেলায় মুখ্যতঃ তিনটি মাস ধরেই হয়ে থাকে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের খবর জেলার একটি মাত্র গ্রামে। বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক দিন নির্দিষ্ট হলে সকলে এই আনন্দোৎসবের শরিক হতে পারে বলেই এই দিন পরিবর্তন। এই দিন পরিবর্তনের মধ্যেই এই দেবতার লৌকিক চরিত্রও লক্ষ্য করা যায়। কোথাও বৈশাখ মাসের যে কোন দিন।

দু' চারিটি গ্রামের পরিসংখ্যানের মাধ্যমে গম্ভীরা পূজার চিত্র দেখানো হচ্ছে—

১. চৈত্র / চৈত্র সংক্রান্তির দু'দিন আগে থেকে বৈশাখের প্রথম চার দিন অর্থাৎ মোট সাত দিন। —হবিবপুর (হবিবপুর থানা), কেবলমাত্র চৈত্রসংক্রান্তিতে—বামনগোলা, ফরিদপুর (বামনগোলা থানা), শৈলপুর (ইংরেজবাজার থানা), দহিল (গাজোল থানা)

২. বৈশাখ / ১লা বৈশাখ থেকে সারামাস পূজা ও উৎসব—সেকেন্দারপুর (ইংরেজবাজার থানা), বৈশাখ সংক্রান্তিতে—আলিপুর (কালিয়াচক থানা), কোন স্থানে বৈশাখের একদিন—বড়কোল (রতুয়া থানা) বৈশাখী পূর্ণিমা (খরবা থানা), বেরুল (বামনগোলা থানা)

৩. জ্যৈষ্ঠ / জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার—আইহো (হবিবপুর থানা),
১৩ই জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ—বালুপুর, গোকুলনগর
কামাত—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের তিন দিন

৪. শ্রাবণ / বোয়ালিয়া (খরবা থানা)

১. ঘটভরা

ঘটভরা সব অঞ্চলের নিয়ম নয়। তিন, পাঁচ বা সাতদিন আগে একটা ঘট জলপূর্ণ করা হয়। একেই বলে ঘটভরা। অঞ্চল বিশেষে এই প্রথা বর্তমান। মূল সন্ন্যাসী বা প্রধান ভক্ত ঘট ভরেন। কখনও বা এই পূজার মূল সন্ন্যাসীর পদ পুরুষানুক্রমে হয়ে থাকে।

পূর্ববর্তী যুগে ঘটভরার দিন একটা বৈঠকে বসে সদাই হত একমত। অবশেষে মণ্ডলের (প্রধান) অনুমতি নিয়ে নিকটস্থ জলাশয়ে অর্থাৎ নদী, পুকুর, খাল, বিল ইত্যাদি থেকে ঘটভরা হয়। সে সময় মূল সন্ন্যাসী সহ অন্যান্য লোকদের পিছনে পিছনে ঢাক-কাঁসি বাজতে বাজতে যায়। ঘটভরার দিন অন্য কোন অনুষ্ঠান হয় না।

গাজনোৎসবের 'ঘরভরা' বা 'গৃহাভরণ' অনুষ্ঠানের প্রকার ভেদ গম্ভীরার 'ঘটভরা'। দু সারিতে জলপূর্ণ ঘট সাজিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করাও হয় কোথাও কোথাও।

২. ছোট তামাসা

গম্ভীরা পূজার দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় 'ছোট তামাসা'। তামাসা কথার অর্থ মজা, আনন্দ রঙ্গ রসিকতাপূর্ণ অনুষ্ঠান। গত শতাব্দীতে তামাসা শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ছিল। গৌরদাসকে লেখা মহাকবি মধুসূদনের একটা চিঠিতেও আছে—How do you like to see the Tamasha, if you please I can b≥ with you at 7 in the evening. এদিনে শিব-দুর্গার পূজা হয়। ছোট ছোট ছেলে-ভক্তকে বলে 'বালাভক্ত' অর্থাৎ বালক ভক্ত। এদিন ও পরের দিন সন্ধ্যায় মূলভক্ত গম্ভীরা মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য ভক্তদের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড করিয়ে দেন। প্রধান ভক্ত শিব বন্দনা পাঠ করান। প্রত্যেককে এক পায়ে দাঁড়াতে হয়। প্রত্যেক বন্দনার এক অংশ শেষ হলে ঐ এক পায়েই দু পায়ে লাফিয়ে এগিয়ে আবার পূর্বস্থানে ফিরতে হয়।

শিবগড়ার বন্দনা বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক হলেও মূল উদ্দেশ্য কিন্তু একই। কোন কোন স্থানে কাঁটার বিছানা করে উপবাসী ভক্তগণ তাতে গড়াগড়িও দিত। তখন মুখ্য বন্দনা-গায়ক শিবগড়ার বন্দনা করত। অধুনা শিবগড়ার বন্দনা অধিকাংশ গম্ভীরা থেকে বিদায় নিয়েছে। হবিবপুর থানার আইহো গ্রামের অশীতিপর কবি সতীশচন্দ্র গুপ্ত, কাব্য রত্নাকরের (বর্তমানে প্রয়াত) নিকট থেকে ১৯৬৭ সালে প্রাপ্ত কয়েকটি গান দেওয়া হ'ল। পূর্ব্ববর্তী পর্যায়ে আমরা কয়েকটি গান সংকলন করেছি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে কিছুটা অংশ বলা হলে মণ্ডপস্থিত সকলে সমস্বরে বলে উঠত—'শিবনাথ কি মহেশ'! পয়ার ছন্দে দেহশুদ্ধি, জীবসৃষ্টির বন্দনা করত এবং প্রতি পয়ারের শেষে সমবেত ভক্তগণ 'শিবনাথ কি মহেশ' উচ্চারণ করত।

ক. গম্ভীরার বন্দনা—

জলবন্দ, স্থলবন্দ, বুড়াশিবের গম্ভীরা বন্দ
আর বন্দ সরস্বতীর পা,
…'বাঁশুয়া বাহনে শিব তার চরণে প্রনাম ॥…

শিবনাথ কি মহেশ (ধানতলা গম্ভীরা)।

খ. পৃথিবীর জন্মকথা—

নাই ছিল জলস্থল দেবের মণ্ডল।
কোনরূপ ছিল ধর্ম হয়ে শূন্যাকার।…

এই বন্দনা অংশে ধর্মমঙ্গলের সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তারপর দেবগণের সমুদ্রমন্থন, দেবতার আবাহন, কার্তিক, লক্ষ্মী, ভগবতী, ব্রহ্মা ইত্যাদির এমন কি যমরাজের আবাহন পয়ার ছন্দে করা হত। শিব গড়ার বন্দনার অনেকগুলি অংশ আছে। সেগুলি যথাক্রমে—ক. সৃষ্টি প্রকরণ, আবাহন, খ. শূন্যাকারে ধর্মস্থিতি, পৃথিবীর জন্মকথা, কূর্ম গ. দেহশুদ্ধি, মুখশুদ্ধি, ঘ. মন্দির শুদ্ধি, ঙ. জীবসৃষ্টি চ. কপিলা গমন ছ. দেবগণের সমুদ্রমন্থন, দ্রব্যবণ্টন জ. গম্ভীরা বন্দনা ঝ. দেবতা আহ্বান।

প্রয়াত হরিদাস পালিত মশায় সংকলনটি ধানতলা নিবাসী গদাধর দাসের নিকট থেকে পেয়েছিলেন।[১] প্রয়াত কবি সতীশ গুপ্তের পাণ্ডুলিপি যা বর্তমান লেখকের নিকট আছে তার সঙ্গে সংকলনটির মিল বর্তমান।

শিবগড়ার আরও দু'চারটি বন্দনা—

গ. লালগিরি পর্বত দর্শন দোয়ার।
তাহাতে জন্ম না হইল আমার ।।
হাত মোর শুদ্ধ
পা মোর শুদ্ধ
শুদ্ধ মোর পঞ্চমুখের বাণী
না পূজিলাম আদ্যের ভবানী।
আগমপূর্ব বেদ দেহশুদ্ধ শিবদোহারে জানি ।।

শিবনাথ কি মহেশ (মণিপুর গম্ভীরা)

ঘ. স্বর্গের কপিলা, মর্তে নামিলা।
বিশ্বেশ্বর ব্যাঁত (বৃষ) বাহনে চড়িলা ।।
নরলোক তার বসে গোথনে (গোস্তনে বা বাঁট) হয় পৃথিবী শুদ্ধ,
তাতে উজে দধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ।
কহনত গুরু-গোঁসাই সরস্বতীর বরে।
কপিলার জন্মকথা কহি সবার ভিতরে ।।···শিবনাথ কি মহেশ।

ঙ. বাণ নাচে রক্ত গায়ে বাহুহীন হৈয়া।
শিব তুষ্ট হৈলেক সাঙ্গপাঙ্গ লৈয়া।
শিবের দুরন্ত ভক্ত বাণ মহারাজ।
কাল ভৈরব হৈয়া মিলি গেল আজ ।।
শঙ্কর সঙ্গেতে সাথী কৈলাসেতে ধাম।
তাহার চরণে করি দ্বাদশ প্রণাম ।।

উপরোক্ত ঘটনাটি হরিবংশে বর্তমান। শোণিতপুরাধিপতি শিবভক্ত মহারাজ বাণের কন্যা উষার সাথে দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন প্রণয় হয়। রুষ্ট বাণ অনিরুদ্ধকে লৌহ কারাগারে নিক্ষেপ করে বলি দিতে মনস্থ করেন। অনিরুদ্ধ একাগ্রচিত্তে মহামায়ার স্তব-স্তুতি করলে মহামায়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী রাত্রে তাঁকে মুক্ত করেন। কৃষ্ণ এ ঘটনা জেনে শোণিতপুরে এসে ঘোরতর রণে বাণরাজাকে পরাজিত করে তাঁর সহস্র বাহুর নয়শত আটানব্বইটি বাহু ছেদন করে শিরশ্ছেদনে উদ্যত হন। বাণরাজা তখন শিবকে স্মরণ করায় শিব আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেন। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র সংযত করে অন্তর্হিত হন। বাণ রক্তাক্ত কলেবরে শিবের সম্মুখে নানাপ্রকার অদ্ভুত নৃত্য প্রদর্শন করতে

থাকেন। ভূতল শোণিতাক্ত হয়ে ভয়াল হয়ে উঠল। এই অদ্ভুত বাণ নৃত্যই গম্ভীরা মণ্ডপে কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী, বাশুলী ইত্যাদির নৃত্য।

বাণের নৃত্যে তুষ্ট শিব তাঁকে চারটি বর দিতে রাজী হলেন। প্রথম বরে, কৃষ্ণের চক্রাঘাতে বাণরাজার দেহের যন্ত্রনার হয় উপশম, দ্বিতীয় ববে বাণরাজা অমর ও অজেয় হয়ে চিরদিন শিবেব সেবকরূপে গণ্য হন, তৃতীয় বরে, বাণেব ন্যায় শোনিত কলেবরে যে কোন ভক্ত ঐ ধরণের নৃত্য প্রদর্শন করলে তিনি শিবের পুত্রত্ব লাভ করবেন এবং চতুর্থ বরে, বাণরাজ শিবের প্রমথগণের প্রধান হয়ে চিরকাল মহাকাল নামে খ্যাত হন। এই মহাকাল পার্শ্ববর্তী দিনাজপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত মহাকাল। ভারত শিবের প্রথম মিশ্রণ লোক-সমাজের উপাস্য এই মহাকালের সঙ্গে। মহাকাল শিবনামে ভূষিত হলেন। রুদ্র শিবে মহাকালের রূপগুণ ও পূজারীতি আরোপিত হল।[২] বিশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গম্ভীরাপূজার সময় উপবাসী শিবভক্তেরা কটিদেশে বাণবিদ্ধ করে নৃত্য করে, এটিই বাণনৃত্য নামে খ্যাত। দুদিকের কটিদেশে দুটি লোহার বাণ বিদ্ধ কবে বাণের অগ্রভাগে মশাল জেলে (সরষে তেল ন্যাকড়ায় দিয়ে) মাঝে মাঝে ধূপধুনা দিয়ে ঢাকেব তালে নৃত্য করে ভক্তেরা।

ছোট তামাসার দিন সন্ধ্যায় আরতির সময়ে বন্দনাপাঠকালে ভক্তগণ একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে শিবনাম উচ্চারণ কবে।

রাত্রিতে নাচ-গান ও মুখোশ নৃত্য প্রদর্শিত হয়। মুখোশ (মুখো, মুখা) কে স্থানীয় ভাষায় বলে মুখা। একক (solo) ও যৌথ (group)-দুই নৃত্যই হয়। মূল কাহিনী পৌরাণিক। লোকায়ত বিষয়বস্তুও স্থান করে নিয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচিতব্য।

৩. বড়তামাসা

গম্ভীরার তৃতীয় দিনকে বলা হয় বড়তামাসা।

এই অনুষ্ঠানও এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবলমাত্র মুখোশনৃত্য (মুখা) হয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের অনুষ্ঠানটির উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে।

এই দিন দুপুরে হর-গৌরী পূজা। দ্বিপ্রহরে প্রথমে ভক্তদের হয় শোভাযাত্রা। কালীঘাটের নীলপূজার গাজনের সন্ন্যাসীদের শোভাযাত্রার মত। সব বয়সের পুরুষেরা এতে অংশগ্রহণকারী। প্রত্যেক গম্ভীরা-মণ্ডপ থেকে ঢাকসহ ভক্তগণ

বৈচিত্র বেশভূষায় নৃত্য করতে করতে অগ্রসর হত। ভূত, পেত্নী, বাজিকর, বাজিকর-স্ত্রী, সাঁওতাল, তুবড়ীওয়ালা প্রভৃতি বেশ ধারণ করে এক মণ্ডপ থেকে অন্য মণ্ডপে যেত। ত্রিশূলাকৃতি ছোট তুটি বাণ বক্ষের দু দিকে বিদ্ধ করে তেলে ভেজানো ন্যাকড়ায় আগুন ধরিয়ে ধূপ-ধুনা ছড়িয়ে দিত। এটিই এদিনের অনুষ্ঠান।[৩]

সন্ধ্যার সময় হনুমান মুখা মুখে বেঁধে উপস্থিত হয় একজন নর্তক। কাঁচা কলার পাতায় সুদীর্ঘ লেজ তৈরী হয়। তুজন লোক একটা কাপড় ধরে রাখে। হনুমানের লেজে আগুন দেওয়া হলে সে শব্দ করে ক্রমাগত এপার-ওপার হয়। এটি লঙ্কা দহনের অভিনয়।

৪. ফুলভাঙ্গা

ফুলভাঙ্গা এক বিশেষ প্রথা।[৪]

এ পুজাও এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন। কণ্টকী গাছের নরম শাখার সাথে সিদ্ধিগাছের তাড়া একত্র করে বুকে নিয়ে বালাভক্তগণ নৃত্য করে। নৃত্য ঢাক বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। নর্তকেরা নৃত্যরত অবস্থায় গম্ভীরায় এসে 'নাম ডেকে' কণ্টক-গুচ্ছ মন্দিরের পুরোহিতের নিকট গচ্ছিত রাখে। আগের দিনের মত 'শিব গডার বন্দনা' শেষ হলে পুরোহিত শান্তিজল ছিটিয়ে দেন। ভক্তগণ আপন আপন ফুল নিয়ে ঢাক বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে ও এক এক সময় ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে। সে ফুল গম্ভীরার মধ্যে রক্ষা করা হয়। পরে একটু রাত হলে [রাত দ্বিপ্রহর নাগাদ] ছোট ছোট নৃত্য হয়। এ নৃত্যও মুখ্যতঃ মুখোশ নৃত্য (মুখা নৃত্য)। ভূত-প্রেত, রাম-লক্ষ্মণ, শিব-তুর্গা, কালী, ঘোড়ানৃত্য, চালিনৃত্য, কার্তিক নৃত্য, পরী বা পইরী নৃত্য, নারসিংহী নৃত্য, বাশুলী নৃত্য ইত্যাদি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ডোম ও হাঁড়িরা মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য প্রদর্শন করত। বর্তমানে মালদহের বামনগোলা থানার জগদলা গ্রামের একটি মাত্র গম্ভীরা অনুষ্ঠানেই ঐ ধরণের নৃত্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু পশ্চিম দিনাজপুরের তপন ও গঙ্গারামপুর থানার কয়েকটি গম্ভীরা অনুষ্ঠানে মড়ার মাথা নিয়ে এ ধরনের অনুষ্ঠানের খবর আছে আমাদের।

ফুলভাঙ্গা অনুষ্ঠানের মধ্যে যাতু বিশ্বাস ও সর্বপ্রাণবাদের (animism) ধারণাসূত্রে আদিম আচার ব্যাপকভাবে লক্ষিত হয়, এর মধ্যে আমরা রিলিজিয়ন

(Religion) এর প্রাক্-স্তরের আচরণের সঙ্গে ধর্মীয় আচরণের আদিম বিশ্বাস ও পরবর্তী ধ্যান ধারণার সংমিশ্রণ অনুভব করি। আবার সাঁওতালী ভূত ও ভূতশান্তির আচারও লক্ষণীয়।[৬]

৫. মশান নাচ

চতুর্থ দিনের প্রারম্ভে 'মশান নাচ' দিয়ে আহারা সুরু হয়। প্রত্যূষে বা ব্রাহ্মমুহূর্তে 'মশান নাচ' হয়। সে নৃত্য ভয়ঙ্কর। আলুলায়িত কেশ, বিরাট টিপ, সালঙ্কারা, বিকট বদনা বিচিত্র বেশে নারী রূপে সজ্জিতা বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর নৃত্য ধূপ-ধুনায় আচ্ছন্ন সমগ্র পরিবেশ ভয়াল হয়ে ওঠে। কালী, চামুণ্ডা ও বাশুলী নৃত্যেও এই ধরণ লক্ষ্য করা যায়। ঢাকীর মাতান বাজানর সময় মুখোশের রূপ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। পুরোহিত পুষ্পমাল্য ও ধূপ-ধুনা সামনে রাখলে কালী মুখোশ প্রভৃতি মাথা ঘুরিয়ে ধোঁয়া গ্রহণ করে শান্ত হয় এবং শেষে নিঃস্তেজ হয়ে পড়ে। এখানে যাদুক্রিয়া বর্তমান। পরে নর্তক একে একে অন্য গম্ভীরায় যায় এবং নৃত্য সমাপন করে মহানন্দা, টাঙ্গন, কালিন্দ্রী প্রভৃতি নদীতে বা অন্য জলাশয়ে স্নান করে ঘরে ফেরে। জেলেদের মধ্যে এই নৃত্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়, তাই মশানকে জলদেবতা বা অপদেবতাও মনে করা যায়। আবার রাজবংশীদের মধ্যে মাশান নামে এক অপদেবতা বর্তমান। তার প্রভাবও গম্ভীরায় পড়া স্বাভাবিক। সাঁওতালদের মধ্যেও মাশান অপদেবতা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মশান দেবতার দ্বিবিধরূপ—স্ত্রী ও পুরুষ লোকধর্মে বর্তমান। স্ত্রীরূপে তাঁকে কালীজ্ঞানে পূজা করা হয়। তখন তিনি সিংহবাহিনী ও চতুর্ভূজা। পদতলে শিবের শয়ান মূর্তি। পুরুষ দেবতারূপে তাঁকে শিব বা শিবানুচর, কখনও বা অপদেবতা জ্ঞানে উপাসনা করা হয়। অমঙ্গল, মহামারী এবং পথ-দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই দেবতার আরাধনাও হয়ে থাকে কোথাও বা।[৭]

৬. আহারা (বোলবাই বা বোলাই)

বড় তামাসার পরদিন মশান-নাচের পর হর-পার্বতীর পুজা হয়। পূজান্তে হোম হয়। ব্রাহ্মণ ও কুমারীভোজনও হয় এই সময়। সেই জন্য আহার থেকে

আহারা কথাটী এসেছে বলে মনে হয়। কাঁচা বাঁশ বা কঞ্চিতে কলার ফুল (মোচা), আম, বেল, শষ্য বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে পূজা হলে আহারা সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদ অথবা আদিম ঐন্দ্রজালিক আচার-বিশ্বাসের কিছু মিশ্রন লুকিয়ে আছে সন্দেহ নেই।

কৃষি-উৎসব উর্বরাশক্তির পরিচয়বাহী। শৈব বিবাহ তারই রূপক। আহারা অনুষ্ঠানে তারই পরিচয় মেলে।

এদিন কোথাও কোথাও সঙ বেরোয়। গান হয় কিন্তু মুখোশনৃত্য হয় না। গান রচনা করেন 'খলিকা'। আরবী শব্দ 'খলীফ্‌হ্'-এর বাংলা অর্থ-'ওস্তাদ'। সঙ্গীত রচনাকারকে ওস্তাদও বলা হয়। মুসলিম রীতিতে এখানে গৌড়বঙ্গের মুসলিম প্রভাব পড়েছে নিঃসন্দেহে। 'মুদ্দা' বলতে বোঝায় সার বা বিষয়বস্তু। এটির উৎসে আরবী শব্দ-'মুদ্দা' বর্তমান। খলিফাকে মুদ্দা রচনা করতে বললে তিনি গীত রচনা করেন। এই দিনে 'শিবের চাষ' অভিনীত হয়। কেউ হাল চালায়, কেউ ধান রোপন করে, কেউ বা বপন করে, কেউ গবাদি পশু সেজে ধান ভক্ষণ করতে শুরু করে। ধানকাটা অভিনয়ের পর গ্রামের প্রধান জিজ্ঞাসা করেন—'কতধান'? উত্তরে বৎসরের মোট ধানের পরিমাণ হয় নিরূপিত। এই অনুষ্ঠানটি এখন অবলুপ্ত। কিন্তু 'খলিফা' নামটি গম্ভীরা গানের উপরে আলকাপের প্রভাব নিরূপণে কাজে লাগে। আজকের আলকাপ রচয়িতাদের খলিফা বলা হয়, কিন্তু গম্ভীরা রচয়িতারা কেহই খলিফা নন।

৭. সামশোল ছাড়া

পূজার চতুর্থ দিনে আহারা ছাড়াও নিম্নলিখিত আচারগুলি অনুষ্ঠিত হত অর্ধশতাব্দী পূর্বে যার মধ্যে অন্যতম 'সামশোল ছাড়া'।

একটা ছোট মাছ জিইয়ে রাখা হয়। সেটিকে নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে ছাড়া হচ্ছে এ অনুষ্ঠান। এই উদ্দেশ্যে একটা নতুন গর্ত খোঁড়া হয়, আহারার দিন সন্ধ্যাবেলায় ঐ মাছ ছাড়া হয় এবং ভক্তগণ ঐ গর্তের এপার-ওপার লাফ দিয়ে পার হয়। গর্তের দুদিকে দুটো বাঁশ আড়াআড়ি করে বাঁধা হয়। ফুলভাঙ্গার ডালপালা রেখে তাতে ধূনো দিয়ে আগুন দেওয়া হয়। ভক্তগণ একে একে পা বেঁধে বাঁশ থেকে ঝুলে পড়ে এবং সাতবার দোল খায়। কোথাও কোথাও একে আগুন ঝাঁপ বা পাট ভাঙ্গাও বলে। গাজনেও এ ধরণের অনুষ্ঠান

লক্ষ্য করা যায়।[৮] ধর্মমঙ্গলে এর উল্লেখও আছে। 'শূন্যপুরাণ-এর 'অথ বৈতরণী' পরিচ্ছেদে রামাই পণ্ডিতের বর্ণনাকে মনে পড়িয়ে দেয়—

খেলা করেন্ত নানা বন্নর মাছ।···

নিরঞ্জনর ধন ভাণ্ডার না এ দিল ভরা।

গাভীর পুচ্ছ ধনপতি করএ পার।।

[একটা জলপূর্ণ গর্তকে বৈতরণী ভেবে তাতে মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়। সন্ন্যাসী গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হাওয়ায় সময় পণ্ডিত বেত নিয়ে উক্ত মন্ত্র পাঠ করেন]

৮. ঢেঁকী চুমান বা ঢেঁকী মঙ্গলা

আদিম উপজাতিদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। 'চুমান' কথাটির অর্থ— সিন্দুর লিপ্ত করা। আগে এ অনুষ্ঠান হতো, এখন নেই।

এইদিন সন্ধ্যায় ভক্তগণ হলুদ ও সিন্দুর লিপ্ত ঢেঁকী আনে নারীদের উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে। একজন নারদ সেজে ঢেঁকীর উপরে বসে এবং ভক্তগণ ঢেঁকী বাহনের নারদকে নিয়ে শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করে শেষে ঢেঁকীকে গম্ভীরার প্রাঙ্গণে রাখে।

'শূন্যপুরাণে ঢেঁকীবাহনে নারদের আগমনের চিত্রের অনুরূপ ঢেঁকী মঙ্গলা।

শূন্যপুরাণ / অথ ঢেঁকী মঙ্গলা

তেত্তিস কোটী দেব বসিলেন সব

গন্ধর্ব কিন্নব।।···

কোটাল চারিজনে আদেসি দেবগণে

নারদে আনাহ তরাগতি।

চলিল অতঃপর মুনি বরাবর

কহিল দেবর ভারতী।।

সুনিআ মুনিরাজ বাহন করিল সাজ

ঢেঁকি পিঠে করি আরোহণ

ভাবি জুগেসর চলিল মুনিবর

সুনিয়া বারমতি ভরণ।।···

ত্রিদেব মহারাজা ঢেঁকীর করিলা পূজা
সুগন্ধির পুপ্ পুর মালা দিআ
দেবকন্যা মেলি দিআ হুলাহুলি
আনন্দেতে ঢেঁকী মঙ্গলিআ ॥
বাজাএ জএঢাক মেঘর সমডাক
সুনিতে সুধনি বাজনা ।...

কৃষিনির্ভর বাংলার গৃহনারীদের কাছে ঢেঁকীর মূল্য ও সম্মান অনেক। সে কারণে এ উৎসবেও তার উল্লেখ্য স্থান।[৯]

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে সামশোল ছাড়া ঢেঁকী, চুমানো এবং শিবের চাষ অভিনয়ের মধ্যে কৃষিজীবি সমাজের লৌকিক উৎসবে আদিম কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিশ্বাস গত লক্ষণ ও পরিচয় সুপরিস্ফূট, যদিও তা আজ অতি প্রচ্ছন্ন।

১. পালিত হরিদাস—তদেব, পৃ—১৮-১৯
২. ভট্টাচার্য গুরুদাস—বাংলা কাব্যে শিব, পৃ—৭৪
৩. পালিত হরিদাস—তদেব পৃ—৩৯
৪. ঘোষ প্রদ্যোত—গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব। একাল ও সেকাল, পৃ. ১১
৫. ঐ —পৃ. ১৮-১৯
৬. Hunter W.—Annals of Rural Bengal P 127, 136
৭. কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি, ১৩৮১, পৃ—২৪
৮. ঘোষ প্রদ্যোত—প্রাগুক্ত পৃ. ২০
৯. প্রাগুক্ত —পৃ. ২০-২১

বিস্তারিত বিবরণ—

দুটি গম্ভীরা পূজার বিস্তারিত বিবরণ এই পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হ'ল।

বিংশ শতকের অর্থনৈতিক সংকটে পড়েও গম্ভীরা পূজা স্তিমিত হয় নি। অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে তার জাতীয় উৎসবের চরিত্র আজ আর নেই বটে, তবে সার্বজনীন ২/৩টে পূজা অনেক গ্রামেই হয়ে থাকে আজও। সর্বাপেক্ষা সংহতি-পূর্ণ পূজা এখন অনুষ্ঠিত হয় হবিবপুর থানার আইহো গ্রামে। যদিও সংখ্যার দিক থেকে সে দ্বিতীয়। প্রথম ইংরেজবাজার, তৃতীয় পুরাতন মালদহ।

আইহো/ মালদহ (ইংরেজ বাজার) শহর থেকে ৮ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে আইহো গ্রাম। ফারসী ভাষায় রাহী শব্দের অর্থ পথিক বা তীর্থযাত্রী। পূর্বাঞ্চলবাসী পাণ্ডুয়া-যাত্রীগণ (রাহী) এই স্থানে বিশ্রাম করত বলে রাহী (হো) > রাইহো > আইহো হয়েছে বলে মনে হয়। এখানে পূজার সংখ্যা ক্রম-হ্রাসমান তবুও সতেরটি গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তারা যথাক্রমে—হাটখোলা, কামারপাড়া, নামোটোলা, আদর্শ, মালোপাড়া, ছত্রিশী, ঠাকুর-পাড়া, ধুলোউড়ি, কুমারপাড়া, মঠ, রতিরামপাড়া, চাঁদপাড়া, নবীন সংঘ, যাদব-নগর, বাশুলীতলা, সিংহবাহিনী ও যাদবনগরের বেলতলার গম্ভীরা নামে পরিচিত।

ক. মঠের গম্ভীরা পুজার বিবরণ/ এখানকার পূজামণ্ডপ তৈরী হয় টিন, ত্রিপল দিয়ে। প্রাচীনকালের মণ্ডপসজ্জার জৌলুস না থাকলেও কাগজের ফুল, দেবদারু পাতা দিয়ে সাজানো হয়। জনসাধারণের চাঁদায় এর ব্যয় নির্বাহ হয়। ৩½ ফুট থেকে ৪ ফুট দণ্ডায়মান মাটির শিব। কোন বার উপবিষ্ট শিবও দেখা যায়—বাঘছাল পরিহিত, হাতে ত্রিশূল, ডমরু। মূল্য ১৫ থেকে ২৫টাকা। এখন এই অনুষ্ঠান তিনদিন ধরে হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের দ্বিতীয় শুক্রবারে পূজা সুরু হয়। প্রথমদিন ছোটতামাসা ও ঘটভরা। ১২/১২-৩০ টায় আচমন, গন্ধাদির অর্চনা, ও নারায়ণাদির অর্চনা, স্বস্তিবাচন, সংকল্পবিধি, সামবেদীয় জলশুদ্ধি,

আসন শুদ্ধি, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, দ্বারদেবতাদির পূজা, ভূতোপসারণ, দিগ্বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, প্রাণায়াম করার পর ঘটস্থাপন।

ধ্যান—ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং

চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকলেপ্রজ্বলাং

পরশুমৃগবরা ভীতহস্তং প্রসন্নং।……ইত্যাদি। তারপর প্রণাম। ঘট-স্থাপনের পর সূর্যার্ঘ, গণেশপূজা, প্রণাম, বিষ্ণুপূজা, নবগ্রহাদির পূজা ও দিকপালাদির পূজা করা হয়। ঘটে থাকে একটি আম্রপল্লব, একটি গামছার আচ্ছাদন। ঘটের তলে থাকে ধান, সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা দেওয়া হয় ঘটে। পুষ্প, ধান্য, ফল, জল, পল্লব, কলস ও সিন্দুর মন্ত্রপূত করা হয়। ঘটের চারদিকে কঞ্চির চারটি খুঁটা পোতা হয়। এ গুলিকে বলে কাণ্ডাৎ। পূজা চলে ১—১-৩০ পর্যন্ত।

পূজাবিধি ও ধ্যানমন্ত্রগুলি পরবর্তীকালের যোজনা। উচ্চবর্ণের শিবপূজা-বিধি থেকেই এগুলি নেওয়া হয়েছে। পুরোহিত এখন মদনমোহন মিশ্র। এটি যে লৌকিক দেবতা তার দুটি সূত্র বর্তমান। ১. উন্মুক্ত স্থানে এ পূজার ব্যবস্থা ২. পূজার নির্দিষ্ট তিথি নক্ষত্র নেই।

রাত্রি ৭টা নাগাদ ছোট ছোট ছেলেদের (বালাভক্ত) নৃত্য—মাতাল, ঘোড়া, কলস, মেমসাহেব, মহিষ, টাপা, শিব-দুর্গা। এ নৃত্যে ঢাক ও কাঁসি ব্যবহৃত হয়। কোন সময় দুটি ঢাকও থাকে।

পরের দিন পূজা সুরু হয় দুপুর প্রায় ১২ টায়। পূজা চলে বড়তামাসায় প্রায় দেড়টা পযন্ত। শিবপূজা হয় ছোট তামাসারই মত। কেবল ঘটস্থাপনা বাদ পড়ে। বিকেল ৪টা নাগাদ সঙ বেরোয়। গ্রামের খবর বা রিপোর্ট (Report) এর বিষয়বস্তু। তিন-চার জন সঙ সেজে বিভিন্ন মণ্ডপ পরিভ্রমণ করে।

সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় বাণ নৃত্য। চারজন পুরুষ উপবাসী থেকে কোমরে বাণ গেঁথে তার মাথায় আগুন ধরিয়ে নৃত্য করে। চলে ঘণ্টা দুয়েক। এটাও গম্ভীরা পরিক্রমা করে।

রাত আটটা নাগাদ মুখা বা মুখোশ নৃত্য সুরু হয়। ঝাঁটাকালী, পাখাসহ পরী (পইরী), গৃধিনীবিশাল, উগ্রচণ্ডার নৃত্য হয়।

গম্ভীরা নৃত্যে নারীরা অংশগ্রহণ করে না। পূর্বে গম্ভীরার বাণনৃত্যে মেয়েদের সোনার গহনা পরে পুরুষশিল্পীদের নাচতে দেখা যেত। পঁচিশ-তিরিশ বছর

আগেও ১৫-২০ ভরি সোনার গহনা তারা পরত। শিল্পী ছাড়া বাদ্যশিল্পীদের অর্থাৎ ঢাক ও কাঁসি বাদকদের গহনা পরার ও রেওয়াজ ছিল।

এ নাচ চলে সারারাত। এমন কি পরদিন সকাল ৬।৭টা পর্যন্ত। গ্রামে এক অপূর্ব উৎসবের চিত্র পরিলক্ষিত হয় এখনও।

খ. জগদলা

মালদহ শহর থেকে ২৪ মাইল উত্তর-পূর্বে বামনগোলা থানান্তর্গত জগদলা গ্রামের গম্ভীরা পূজায় অনার্য আচার-আচরণ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে জগদলায় পালযুগে বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ছিল। তবে মালদহ-দিনাজপুরে বহু জগদলা নাম থাকায় এ স্থানটিই যে জগদ্দল মহাবিহারের সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা এখনও একমত নন।[১]

জগদলার পূজা কয়েক শতাব্দীর। সুরু কবে তার খবর নেই। ইদানীং-কালে মাটির ঘরের উপর টালি দিয়ে নির্দিষ্ট গম্ভীরা ঘর তৈরী হয়েছে। এ গম্ভীরার নামে ১৪ বিঘা জমি দেবোত্তর করা আছে। এখন সেবাইত জংলী চৌধুরী, ধীরেন চৌধুরী ও অমিয়পদ রায়। অনুসন্ধানে জানা যায় যে আদিতে এ গম্ভীরার যাঁরা সেবাইত তাঁরা জাতিতে হাঁড়ি। হাঁড়ি বংশোদ্ভূত প্রয়াত কৃষ্ণ মণ্ডল এবং তাঁর পূর্বপুরুষেরাই এ পূজার সেবাইত।

এ গম্ভীরা পূজা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। শিবের পূজা হয় দুপুরে। গম্ভীরার দুটি ঘর। একটিতে আছে বুড়োকালী ও বাশুলীর থান। পাটকালীর মূর্তি তৈরী করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয়টিতে আছে শিবলিঙ্গ।

প্রথমে শিবের পূজা হয়। এ পূজা সাধারণ শিবপূজারই মত। বিকেল চারটে থেকে রাত্রি ৮/৮-৩০ পর্যন্ত নৃত্য হয়। এখানকার নৃত্য অন্য গম্ভীরা-মণ্ডপ থেকে স্বতন্ত্র। মুখ্য নৃত্য এখানে তিনটি। ১. খাঁড়ার উপরে দাঁড়িয়ে নৃত্য—একটি মন্ত্রপূত খাঁড়াকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। তার উপর একজন নৃত্যবিদ নাচতে থাকে মিনিট দশেক ধরে। ২. নরমুণ্ড নিয়ে নৃত্য—মড়ার মাথা নিয়ে একটা লোক মিনিট দশেক এই নৃত্য করে। অনার্য সুলভ ঢঙ-এ নৃত্য। ৩. ভূত-পেত্নীর নৃত্য। ঢাক ও কাঁসি এ নৃত্যের অঙ্গ।

সন্ধ্যাবেলায় হয় 'সাঁজাল' অনুষ্ঠান। সন্ন্যাসীর মন্ত্রপূত একটি হাঁড়িতে ধূপ,

সরষেবাটা, পাটকাঠি ও কুলের কাঠ দিয়ে আগুন দেওয়া হয়। নৃত্য করে বালাভক্ত।

সন্ধ্যায় একধরণের গানও হয়। তার নাম বোলাই। এর বিষয়বস্তু স্থানীয় সমাজের ত্রুটি, কুৎসা বা কেচ্ছা। তবে বছর কয়েক এ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে।

'বল ভাই'—এই রকম এক ধূয়া (Refrain) থাকে বলে এটিকে বলে বোলাই। একজন নৃত্যবিদ একে বলেছেন—বলুয়াই বা বল্লুয়াই।[২] কিন্তু এটি ধূয়া বল ভাই>বলআই>বলাই>বোলাই এসেছে বলে মনে করা সঙ্গত।

সন্ধ্যায় হয় হোম ও পূজা। স্থানীয় ভাবে একে বলা হয় 'ভোগ সহরা'। পাঁঠা বলিও হয়, তবে সে বলি শিবের নিকট নয়—মহামায়া, বাশুলী ও পাটকালীর নিকটে।

মধ্যরাতে হয় চুরির অনুষ্ঠান। বহু গৃহস্থের বাড়ী থেকে সিদ্ধি, কলাসহ কলাগাছ, ঢেঁকী, বাঁশ, এলাঙ্গীর কাঁটা (একধরণের গাছ), এলান ফল, ঘরের চালের খড় চুরি করে এনে নৃত্যবিদেরা নাচতে থাকে। এটি বাংলার আর একটা লৌকিক অনুষ্ঠান—'নষ্টচন্দ্র'কে মনে পড়ায়। সন্ন্যাসী একটির পর একটি দ্রব্য পূজা করেন। এর মধ্যে ঢেঁকী, বাঁশ, কলাগাছ পরে গৃহস্থকে ফেরৎ দেওয়া হয়। পূজারী বর্ণহিন্দু চক্রবর্তী ও তপস্বী পদবীধারীরা পালা করে পূজা করেন। কিন্তু সন্ন্যাসী সমস্ত কার্য পরিচালনা করেন। একজন হিঁয়ালু রাজবংশী এখানকার সন্ন্যাসী। এ পদ বংশানুক্রমিক ভাবে চলছে।

শেষ রাতে হয় শিবের কৃষিকাজ অনুষ্ঠান। এও পরিচালনা করেন সন্ন্যাসী।

সংক্রান্তির দিনে সন্ধ্যাবেলা কেবল পূজা হয় মহামায়া, বাশুলী, পাটকালী, বুড়াকালী ও চামুণ্ডার। আগে চড়কপূজা হত। এখন হয় না, শুধু মেলা হয়। সেটি সংক্রান্তির আগের দিন থেকে দুদিনের। তিনশ/চারশ লোকের সমাগম হয়। মেলার বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। আবার ১লা বৈশাখ অন্য একটি মেলাও বসে, সেটি অবশ্য গম্ভীরার নামে নয়।

শেষ দিন সকলে আমিষ ভোজন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হাঁড়ি, রাজমহালী, বৈশ্যমালী ও রাজবংশী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কোন বর্ণ-হিন্দু এ পূজায় অংশ নেয় না, যদিও দর্শনার্থীর মধ্যে অনেক বর্ণহিন্দু বর্তমান।

---

১. Ghosh Prodyot—The Historical Sites of Ramavati Jagaddal Mahavihara and Nadya. (Paper)

২. বর্ধন মণি— প্রাগুক্ত পৃ. ২৮

২

মুখোশ

বাংলাদেশের লোকায়ত শিল্পকলার ধারায় মুখোশ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মুখোশ শিল্পের উৎস ও তার ক্রম পরিণতি পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ।[১]

অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে মুখোশ দেখা যায় না। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির মৌল উপকরণে আঞ্চলিকতা কাজ করেছে। তাই অঞ্চল বিশেষে মুখোশের বৈচিত্র্য লক্ষণীয়।

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে অসভ্য মানুষ তাব আনন্দের প্রকাশ প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতো। অপদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য তার এই নৃত্য। প্রকৃতিব বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করা সেদিন তার সম্ভব হয় নি। ভেবেছে কোন এক শক্তিমান দেবতা বা অপদেবতার সন্তুষ্টি তাদের ঋদ্ধির জন্য প্রয়োজন। তাই বহুবিধ আচারের (ritual) সঙ্গে নৃত্য কবতো তারা। স্বর্গের দেবদেবীকে (Heavenly bodies) উদ্দামতার মাধ্যমে তুষ্ট করাই ছিল তাদেব কাম্য।[২]

মানব জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে তার প্রকাশ বেদনা নৃত্যগীতাদিতে মিটতো। যেগুলি সংস্কৃতির তৃতীয় উপাদান অর্থাৎ সমাজ সৌধ (super-structure)। বৈজ্ঞানিক মতে সংস্কৃতির তিন অবয়বের অন্য দুটি হচ্ছে ১. জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণ সমূহ (material means) এবং সংস্কৃতির প্রধান আশ্রয় সমাজ যাত্রার বাস্তব ব্যবস্থা (social structure)[৩] আদিম মানুষের নাচগানও সমবেতভাবে কর্মেরই মত। কৃত্য ঘনিষ্ট কাব্য-নৃত্য-গীতাদি ছিল জীবন সংগ্রামেব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার।[৪] এই সব কৃত্য-শিল্প একদিকে যেমন বস্তু জাগতিক প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক, অন্যদিকে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা (magic) ও মহাজাগতিক ভাবপ্রকাশের সহায়ক সৃজন শিল্প।

আদিম সমাজে উৎসব, অনুষ্ঠান, দেবতা, নৃত্য, গীতি-কাহিনী, কাব্য একই নৃত্যের আধারে মিলেমিশে ছিল। সমাজের ক্রমবিবর্তিত রূপান্তরে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া যেমন ধর্মে ও বিজ্ঞানে এসে পৌঁছেচে, তেমনি নাচ-গান কথা প্রভৃতি বস্তু-ভূমি থেকে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ শিল্পরূপ নিতে থাকে। ধর্মকে অবলম্বন করে যেমন পূজা-পার্বণ, তেমনি পুরাণ বা কিম্বদন্তীকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছিল মুখোশ নৃত্য। কখনও বা প্রাণী জগৎও তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। প্রাণীর মুখোশ পরে সেই ধরণের পদক্ষেপে নৃত্য করায় পিছনে একটা যুক্তি হয়ত ছিল যে শিকারী সমাজের মানুষের সামনে সেই জন্তু তার ভঙ্গিমা গ্রহণে সহজেই ধরা পড়বে হয়ত। এই যুক্তির পিছনে ক্র্যাপ্ সাহেব অনুকরণ যাদু (imitative magic) এবং প্রাণী দেবতার (Theomorphic Divinity) উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করার চিত্র দেখেছেন।[৫]

মুখোশ নৃত্যের জন্মকাল জানা যায় নি। তবে ধর্ম যে নৃত্যকে জন্ম দিয়েছে এ কথা ঠিক এবং নাট্টিক শিল্পের (Dramatic Art) জন্মের উৎসে তার অবদান অনস্বীকার্য।

গম্ভীরা মুখোশ নৃত্য বাংলার লোকনৃত্যের অন্তর্ভুক্ত কেন এই প্রশ্নটি প্রসঙ্গ-ক্রমে তোলা যায়।

প্রাচীনকাল থেকে পার্বত্য, প্রান্তিক জাতি, উপজাতিদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মিশ্রণে বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ। প্রয়োজন হলে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষা বিস্মৃত হয়। কিন্তু সুর ও নৃত্য-আঙ্গিক জড়িয়ে থাকে অন্য জাতির নৃত্যগীতি-সংস্কৃতির সঙ্গে। এই সূত্র ধরে বাংলাব লোক সংস্কৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপ-করণে হয়েছে ঋদ্ধ।

নৃত্য-শাস্ত্র ও নাট্য শাস্ত্রোক্ত করণ, অঙ্গহার, পাদভেদ (করণ) কিন্তু একদিনেব সৃষ্টি নয়। আদিবাসী প্রান্তিক উপজাতিদের স্থূল নৃত্যাঙ্গিক আংশিক শোধিত হয়ে (Sophisticated) উচ্চাঙ্গ নৃত্যের আঙ্গিক হয়েছে। লোক নৃত্যের ছিল মৃগীগতি, ভুজঙ্গগতি, ভেকগতি, কুক্কুটগতি, এরই সঙ্গে আছে সিংহ ও ব্যাঘ্র পদক্ষেপ। ধ্রুপদী নৃত্য এইগুলিকে শোধন করে তার সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনার ছাপ রেখেছে।

বাংলার লোকনৃত্যের ভাগ করেছেন নৃত্যবিদ মণি বর্ধন। লোকনৃত্যকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা চলে—

১. বাঙ্গালীর স্বকীয়তা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্যবিশিষ্ট, বাঙ্গালীর প্রথা আচরণ-আচার যুক্ত ও সামাজিক উৎসবের অঙ্গীভূত বাঙ্গালীর নৃত্য। যথা—গাজন, বাউল, রায়বেশে, ঢালী ইত্যাদি।

২. বাংলার জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বাংলার অধিবাসী, অবাঙালী, প্রান্তিক ও পার্বত্যজাতিদের প্রথাপুষ্ট লোকনৃত্যাদি। যথা—লেপচাদের ধান নাচ, শেরপাদেব বিয়াছম নৃত্য, তিব্বতীদের সিঙ্গীছম, মেপাছম, চমরীছম মুখোশ নৃত্য, নেপালীদের ডাম্ফু, মারুণী, মাদল, খঞ্জলী নৃত্য, সাঁওতালদেব সোহরায, শালই পরবের নৃত্য, ওঁরাওদের জ্যাঠাঘারিয়া ইত্যাদি।

আঙ্গিক বিনিয়োগের তারতম্যে লোকনৃত্য আবার দ্বিধারায় বিভক্ত।

১. স্বতঃস্ফূর্ত সহজ, সাবলীল সমবেত গোষ্ঠীনৃত্য

২. জটিল তাল, লয, ছন্দে শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের গতি, চারি, চলন, উপ্লাবন, ভ্রামবী, পাদভেদা ও হস্তকর্মে পুষ্ট লোকসমাজের নাট্যধর্মী নৃত্য।

ভৌগোলিক সংস্থান, পরিবেশ, প্রথা, বীতি ও ব্যবহৃত কথ্য ভাষা ভেদেও কচি বসবোধেব দৃষ্টিভঙ্গী এবং আঙ্গিক প্রয়োগ কৌশলেব পার্থক্য হেতু লোকনৃত্যেব ত্রিধাবা—

১. ধর্মীয আচবণযুক্ত বিশেষ তিথিতে অনুষ্ঠিত নৃত্য—যেমন—গাজন, কালীকাচ, শবখেলা, গৃধিণীবিশাল, মদনকাম, মেচেনী এবং কালী, নারসিংহী, বাশুলী, চামুণ্ডা ইত্যাদি গম্ভীবাব নৃত্য।

২. সামাজিক উৎসবে অনুষ্ঠিত—বহুরূপী. কাঠি, লেঠো ইত্যাদি এব অন্তর্গত।

৩. শক্তিচর্চা ও অঙ্গচালনার কৌশলযুক্ত বণনৃত্যের অঙ্গীভূত—ঢালি, পাইক বা পাইকান, বায়বেশে, শেবপাদেব বিয়াছম নৃত্য, ছৌ ইত্যাদি।

গম্ভীরা মুখোশনৃত্য একদিকে যেমন ধর্মীয় উৎসবেব অঙ্গীভূত, তেমনি অন্য দিকে তা বাংলার প্রান্তিক ও পার্বত্য জাতিদের প্রথাপুষ্ট লোকনৃত্যের ঢঙও কিছুটা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে তিব্বতী ডাইনী মুখোশ নৃত্যের অনুসরণে ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। শ্রীযুক্ত বর্ধন আঙ্গিক বিনিয়োগের তারতম্যে একক নৃত্যেকে লোকনাট্য বলেছেন, এটি সর্বাংশে ঠিক নয়। কারণ অনেক এককনৃত্য কাহিনীকে ধরে নি, তাই নাট্যধর্ম সেখানে নেই একথা স্বীকার করতেই হয়।

আসলে দান ও গ্রহণে সব লোকনৃত্য নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। তবে আদিম জাতির সমাজের নৃত্যরূপ বেশীর ভাগ অংশেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

এখন 'মুখোশ' সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা করা যেতে পারে।

গ্রীক ও লাতিন ধ্রুপদী শব্দ প্রসোপন (Prosopon) ও পারসোনা (Persona)-য় মুখ ও মুখোশ বোঝাতো।

কিন্তু পরবর্তী যুগে বিশেষ করে আধুনিক ইংরাজী শব্দ mask এসেছে ইতালীয় মাস্কেরা (maschera), জার্মানী মাস্কে (maske), ফরাসী masque থেকে। এগুলি লাতিন শব্দ masca, mascha, mascus এবং আরবী শব্দ maskhar ap থেকে। অবশ্য আরবী শব্দের সাধারণ অর্থ ভাঁড়।[৭]

মুখোশের উদ্দেশ্য সাধারণতঃ পাঁচটি—

১. দর্শকের মনে বিচিত্র ভাবানুভূতি সৃষ্টি করা, যেমন দেবতার মুখে বিস্ময় এবং শত্রুতে ভীতি।

২. অতিপ্রাকৃত চরিত্রের রূপায়নের মাধ্যমে রোগমুক্তি (মানুষ, গৃহপালিত পশু এবং শস্যের জন্য) কিংবা যে যে দুষ্ট দানবেরা এই সব বিষয়ে দায়ী তাদের দমন করা।

৩. কয়েকটি অতিপ্রাকৃত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মবোধের দ্বারা ব্যক্তিজীবন অথবা যৌথজীবনের মঙ্গল বিধান করা। যেমন গৃহপালিত প্রাণী, নারী এবং শস্যের উর্বরতা সৃষ্টি।

৪, বিশেষ সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ের মুখোশ পরে নিজের আত্মোন্নতি বা বিশিষ্ট সম্প্রদায় কিম্বা পরিবারের 'টোটেম' অথবা অন্তবৃত্তিকে রূপায়ন।

৫, সামাজিক অন্যায়কারীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন বা সমালোচনা অথবা হাস্যকর অবস্থা সৃষ্টি করে ভাঁড়ামির মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা।[৮]

আর একটা কথা। এর মধ্যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বও বিদ্যমান। যেমন মুখোশধারী মানুষ সেই মুহূর্তে প্রতিপাদ্য চরিত্রে রূপায়িত হয়ে পড়ে। অতএব ভাবমূর্তি ও ভগবান এবং জীবিত ও মৃত চরিত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার বিষয়ে মুখোশ রহস্য ও গুপ্ত বিদ্যার হাতিয়ার।[৯]

মুখোশকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন—১. মুখোশ (Mask Proper)

২. উপ-মুখোশ (Mask Ette)

৩. অনু-মুখোশ (Maskoid)[১০]

প্রথমটিতে উপরে পরে। দ্বিতীয়টি নীচে পরে। তৃতীয়টি মুখোশের সামিল। এটি পরা যায় না। বাংলার ছৌ গম্ভীরায় মুখোশ, ইন্দোনেশিয়ার বৃদ্ধের মুখোশ এবং দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুখোশের ব্যাপক প্রচলন থাকলেও তার উৎস ও বিবর্তনের যথার্থ ঐতিহাসিক ধারা রচনা সম্ভব নয়। বিশিষ্ট একটা সূত্র থেকেও তার জন্ম নয়। বিক্ষিপ্তভাবে প্রতি মহাদেশেই যুগপৎ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মুখোশের প্রচলন আছে।

মুখোশের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা না করা গেলেও সভ্যতার প্রত্যুষে প্রাচীন প্রস্তব যুগের চিত্রকলায মুখোশ পরিহিত নৃত্যাদি কিম্বা শিকারীদের সন্ধান মেলে। এদেব মিলেছে প্রাচীন গ্রীস, মেক্সিকো ও পেরুতে।[১১]

প্রাচীন গ্রীস দেশে নাট্যাভিনয়ে মুখোশ ব্যবহৃত হত। গ্রীসে এটি প্রথম যোগ করেন থেসপিস (Thespis), পববর্তী পর্যায়ে কোয়িরিলাস (choerilus) এর প্রয়োগে উন্নত চিন্তাব ছাপ বাখেন। ইস্কাইলাস আবও সূক্ষ্মতাব পরিচয় দেন।[১২]

যুক্ত বাংলাব বিভিন্ন অঞ্চলে মুখোশ দেখা যায়, যদিও বিংশ শতকের শেষ ভাগে তার ধারা ক্ষীয়মান। সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকট তাব এই অবস্থার জন্য দায়ী, কেবল মাত্র ছৌনৃত্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে তার সমাদর হযেছে।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল এবং ঢাকার বিক্রমপুরে গাজনোৎসবে কালীকাচ্ উল্লেখ্য। কোচবিহার, জলপাইগুড়িতেও কালীকাচ্ বর্তমান। মণিবাবু কাচ শব্দটির অর্থ করেছেন—বেতের যষ্টি দুটিকে। কাচ দ্বারা আহত বিভিন্ন ছন্দের তালে কালীনৃত্য বলেই বলেছেন কালীকাচ।[১৩] কিন্তু এটি সঠিক নয়। 'কাচ' শব্দটির অর্থ বেশ ধারণ। চৈতন্য ভাগবতে তার উল্লেখ আছে। চট্টগ্রামেও বিউ উপলক্ষে মুখা নাচ হয়। বিক্রমপুরে কথাকলির মত গাঢ় রঙে মুখ এঁকে দেওয়াও হত। তারকেশ্বরেও এই ধরণের সন্ন্যাসীদের সাজাতো কালীঘাটের পটুয়ারা। মুখোশের অভাবে হয়ত এগুলো করা হত।

বাংলার অন্য অঞ্চলে প্রচলিত মুখোশের সঙ্গে গম্ভীরা মুখোশের যে পার্থক্য তা হচ্ছে এটি গভীর ভাবে ধর্মের সঙ্গে আজও যুক্ত। মুখোশগুলি মুখ্যতঃ নিম-

কাঠের এবং পুরুষানুক্রমে গৃহে রক্ষিত ও পূজিত হয়। শাস্ত্রোক্ত প্রমাণানুসারে মুখোশ (মুখা) নির্মিত হয়। নৃত্যের আগে গম্ভীরা গৃহে পূজারীর নিকট নূতন কাঠের মুখোশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে নেওয়া হয়। ইদানীংকালে এই পূজা-প্রথা বিলুপ্ত। অনেকের বিশ্বাস যে কোন কোন মুখা জাগ্রত—যেমন কালী, নারসিংহী, চামুণ্ডা। অনেকে মুখা নিয়ে নৃত্য করতে করতে মারাও গেছে। মুখ্যতঃ কাঠ থেকে এই মুখোশ তৈরী ও রঙ শেষ হলে ঘরের কোন এক উচ্চ স্থানে রক্ষিত হয়। রোজ ধূপ-ধুনা ও প্রদীপ দেওয়া হয়। নৃত্যের দিন নর্তক হর্বিষ্যান্ন খেয়ে থাকে, নখ কাটে এবং তেল ইত্যাদি বর্জন করে। মুখোশ পরার সময় মুখোশকে প্রণাম করে নিতে হয়। বড় তামাসার দিন একবার মাত্র নৃত্য করে আবার ঐ একই ভাবে গৃহে রক্ষিত হয় মুখোশ। রঙ উঠে গেলে ঐ একই পদ্ধতিতে রঙ করা হয়। নৃত্যবিদদের উপর ভরও হয়।

মুখোশ : গম্ভীরা ও তিব্বতী

প্রসঙ্গক্রমে গম্ভীরা মুখোশের সঙ্গে তিব্বতী মুখোশের আলোচনা করা যেতে পারে।

গম্ভীরার মত তিব্বতীদের মধ্যেও কাঠের মুখোশের প্রচলন বেশী। তাদের ডাইনী, সিঙ্গীছম ইত্যাদি নৃত্য বিশেষ তিথিতেই হয়ে ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে গম্ভীরারই মত। তাদের মুখোশ নৃত্যে গম্ভীরার মতই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ বর্তমান। গম্ভীরার টাপা, মহিষ-রাখাল, পরী নৃত্য আবার তিব্বতীদের 'মেপাছম' নৃত্যের মত ধর্মীয় নয়। অবশ্য সেগুলি নগন্য।

তিব্বতে ধর্মীয় মুখোশগুলিও লামাগণ নিষ্ঠাসহকারে রক্ষা করেন। রক্ষনের পদ্ধতিও গম্ভীরার মত। তবে পরিবেশ, ভাষা ও আচার-আচরণ অনুযায়ী মুখোশের ঢঙ যে পৃথক হবে তা স্বাভাবিক। তাদের মুখোশের রূপ কিঞ্চিৎ বীভৎস (আমাদের দৃষ্টিতে) এবং কৌতুককর। অপদেবতার চিত্রই তা পরিস্ফুট করে। ভুটিয়ারা মহাকাল বা কাঞ্চনজঙ্ঘার যে মুখোশ নৃত্য করে তাও ঐন্দ্রজালিক নৃত্য।

গম্ভীরার কালী, নারসিংহী, চামুণ্ডা ইত্যাদি নৃত্যে যেমন ঐন্দ্রজালিক ঢঙ লক্ষ্য করা যায়, তেমনি মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য, শবনৃত্য, গৃধিনীবিশাল নৃত্যেও

তান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় যাদুর ব্যবহার যে প্রাচীনকাল থেকে ভারত ও উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল এবং তা থেকেই যে তন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে অনেকেই একমত।[১৪]

ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান আক্রমণে তন্ত্রের পীঠস্থান, বিদ্যায়তন, দেবদেবীর মূর্তি, গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি ধ্বংস ও দগ্ধ করার আগে পূর্ব ভারতে (গৌড়সহ) তন্ত্রসাধনার ব্যাপক প্রচার ছিল। যাঁরা তিব্বত, আসাম, ব্রহ্মদেশ, সিংহল বা যবদ্বীপে পলায়নে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরাই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখেন এ শাস্ত্র। তিব্বত ও হিমালয়ের গহন প্রদেশেই রক্ষিত হয় আসল তন্ত্র।[১৫]

প্রাচীন যুগে ধর্মীয় যাদুবিদ্যা (Religio-magical) সমগ্র পৃথিবীতেই বর্তমান ছিল। যদিও তার বিশিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না, তবুও তার এক একটা অনুষ্ঠান বা আচার অভিষ্ট ফললাভের সহায়ক হত সাধারণ স্বাভাবিক নীতিতে। এই সব যাদুবিদ্যা সর্বপ্রাণবাদেব (Animistic) ঢঙে প্রাকৃতিক শক্তি, গ্রহ-নক্ষত্র, মৃত আত্মীয়-স্বজনের আত্মা, পর্বত, নদী, বৃক্ষ, প্রস্তর, পশুপক্ষীদের পূজা Shaministic ভঙ্গিতে আচাবের মাধ্যমে বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে রূপ লাভ করে। যাঁদের ঐন্দ্রজালিক শক্তি বর্তমান, তাঁরাই পরে দেব-দেবী, যাদুকর এবং পুরোহিত হিসেবে পরিগণিত হন। এবং তাঁদেব কর্ম-সাধনা ও ক্রিয়াপদ্ধতি হয় পুরাণের অন্তর্গত।[১৬]

বিভিন্ন তথ্যেব মাধ্যমে আমরা দেখবো যে গৌড়ের (মালদহের) মুখোশ নৃত্যের মধ্যে যে তন্ত্র ভাবনা ও যাদুক্রিয়া রয়েছে, তা পরবর্তী পর্যায়ে তিব্বতকে প্রভাবিত করেছে, তার মুখোশ নৃতকেও

বাংলা ও বাঙালীর সাধনার মধ্যে কি ভাবে তন্ত্র জড়িয়ে আছে তা বোধহয় সামান্য আলোচনা কবা যেতে পারে এই প্রসঙ্গে।

বর্তমানে প্রায়-নিশ্চিহ্ন নিগ্রোবটু বাংলার পলিমাটিতে যে প্রথম ও ক্ষীণ পদচিহ্ন এঁকেছিল, তার উপরে এসে পড়ে অস্ট্রীক, আলপীয়, দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর বহুবিচিত্র পদছায়া। অবশেষে আবির্ভাব ঘটল দার্শনিক আর্যজাতির। বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত-সমন্বয়ে বাংলার ধর্ম-কর্ম, সাহিত্য, শিল্প নূতন উচ্ছলতায় পথ কেটে এগিয়ে চলে।[১৭] গৌড়ীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির এই বিচিত্র ধারায় পুষ্ট হয়েছে বাঙালীর জীবন ও মানস, সাধ্য ও সাধনা। তার একদিকে ব্রহ্ম উপাসনা ও আত্মশুদ্ধি, অন্যদিকে পশুপূজা ও দেহশোধন; এক দিকে বেদ-স্মৃতি, পুরাণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে যাদুবিদ্যা, কৃত্যকল্পনা ও

ভূতশান্তি; এক পক্ষে তপস্যা ও দার্শনিকতা, অন্য পক্ষে অভিচার ও বস্তু-জাগতিকতা।[১৮]

তন্ত্রে মূলতঃ মাতৃ বা শক্তি উপাসনা বর্তমান। তন্ত্রাচার হিন্দুদেরও নয়, বৌদ্ধদেরও নয়, এর উৎস অতি আদিমকালে। সেই আদিম উৎস থেকে দর্শন বা তত্ত্ববিযুক্ত তন্ত্রাচার অতীতকাল থেকেই প্রবাহিত এবং যুগে যুগে সকল ধর্মেই এটি গৃহীত হয়ে কখনও হিন্দুতন্ত্রে কখনও বা বৌদ্ধতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।[১৯]

তিব্বতে যে তন্ত্রসাধনার প্রচলন ছিল, তা ঐতিহাসিক সত্য এবং তা তন্ত্র-মন্ত্র ও যোগানুষ্ঠান প্রধান।[২০] বাংলাদেশেও এই সময় তন্ত্রসাধনার যে প্রচলন ছিল তা জানা যায়। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের এক তিব্বতী শিষ্য মহাযোগীর মতে অতীশ তাঁর পিতায় নিকট থেকেই তন্ত্রসাধনার দীক্ষা লাভ করেছিলেন।[২১] গৌড়বাসী দীপঙ্কর যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে তিনি গৌড়-মগধের তাৎকালিক বৌদ্ধভাবই শিক্ষা দিয়াছিলেন।[২২] (দীপঙ্কর যে গৌড়বাসী তা মেনে নিলে)

গৌড় (মালদহ) থেকে তন্ত্রের তিব্বতে যাতায়াতেব মূলে ছিল জগদলার বৌদ্ধবিহার। তিব্বতের বহু পণ্ডিত যথা বিভূতিচন্দ্র, ধ্যানশীলা, মোক্ষকরগুপ্ত এবং শুভকবগুপ্ত এই জগদলাব বৌদ্ধবিহাবে ছিলেন এবং এখানেই কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।[২৩]

অবশ্য এটি সর্বাংশে সঠিক নয় কাবণ স্যার জন মার্শাল, আর্ণেষ্ট ম্যাকে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বমাপ্রসাদ চন্দ্র প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নিঃসংশয়ে স্বীকার কবেছেন যে মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাগ্বৈদিক সভ্যতায় শিব-শক্তির উপাসনাব প্রচলন ছিল।[২৪]

তবে এটি ঠিক যে বাংলাদেশে বিশেষ করে পালযুগের উদার আবহাওয়ার মধ্যে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ দেব-দেবীদের মধ্যে এক বৃহৎ সমন্বয়ের পালা চলছিল। বৌদ্ধরা যেমন অনেক ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীকে স্বীকার করে নিয়েছেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সমাজও মহাযানমতের অনেক দেব-দেবীকে গ্রহণ করেছেন। তারা, চামুণ্ডা, বাশুলী, ভৈরব, গণেশ, লোকনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা ঐভাবেই হয় প্রচলিত।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধতন্ত্রসাধনা সমান্তরাল ভাবেই হিন্দু ও বজ্রযানী, মন্ত্রযানী, কাল-তন্ত্রযানী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধকদের মধ্যে মাতৃসাধনা কালী, মহাকালী, করালী, দুর্গা, অপরাজিতা, কাত্যায়নী, মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরবী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি হিন্দু মহাবিদ্যারূপে আবার নীলসরস্বতী, অপরাজিতা,

মারীচি, পর্ণশবরী, প্রজ্ঞাপারমিতা, প্রজ্ঞাউপায় প্রভৃতি বৌদ্ধদেবীদের নিয়ে সার্থক ছিল।

গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের মধ্যে কালী, নারসিংহী, বাশুলী, চামুণ্ডা প্রভৃতির মধ্যে তান্ত্রিকতা প্রকট, তাছাড়া মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য, শব নৃত্য, গৃধিনীবিশাল প্রভৃতিতে তান্ত্রিকতা ও শাবরী প্রথার মিশ্রণ লক্ষণীয়। নেপাল-তিব্বতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার ফলে মুসলিম আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যই ঐ অঞ্চলে গিয়ে নিজেদের রীতিতে আলাদা ঢঙে ঐন্দ্রজালিক নৃত্যে তা পর্যবসিত হয়। দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রায় সেখানে তাঁর বঙ্গভূমির ধর্মোৎসব বলে লামাগণ এদেশের বুদ্ধ ও শিবউৎসবাদি সাদরে তাঁদের উৎসবের মধ্যে গ্রহণ করে হয়ত কৃতার্থ বোধ করেছিলেন। সেই সময়ে ও তার কিঞ্চিৎ পরবর্তীকাল পর্যন্ত তাঁরা গৌড়-মগধের বহু ধর্মানুগবিষয় অনুকরণ করেছিলেন এবং করতে ভালবাসতেন। তাই গৌড়ীয় মুখোশ নৃত্যের অনুকরণ স্বভাবতঃই লক্ষ্য করা যায়।

আসলে এগুলোর উৎস কিন্তু সেই একই অর্থাৎ তান্ত্রিকতা ও যাদু। ধর্ম ও যাদু অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে জীবনের সংকট মুহূর্তে। মানুষের যাদু সন্দেহে বিশ্বাস, দোলাচল মানসিকতায় দৃঢ়তা এবং নৈরাশ্যে আশা জাগিয়ে তোলে। আগেই জেনেছি যে সব দেশের আদিম ধর্মের মূলে এই যাদু। মূল যাদু ক্রমে ধর্ম, বিজ্ঞান ও শিল্পের ত্রিধারা হয়ে যায়। যাদু ও ধর্ম পৌরাণিক কাহিনীকে ভিত্তি করে মুখোশের মাধ্যমে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করায় সচেষ্ট।[২৫]

ধর্ম সম্পর্কে ধারণা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন হলেও প্রায় সকলেই একমত যে রিলিজিয়নের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

যাদুবিদ্যাকে White Magicও বলে। যে যাদু এখন স্বার্থান্বেষী মানুষদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার তাকে বলে ইংরাজীতে Black magic, যা পরবর্তী সময়ে Damned Art বলে পরিচিত। আসলে magic প্রথমে মানুষের হিতার্থেই সৃষ্টি হয়েছিল। পারসিক শব্দ থেকে লাতিন ও গ্রীক শব্দের মাধ্যমে ওটি ইংরাজীতে এসেছে। এর অর্থ পুরোহিত বা জ্ঞানীব্যক্তির মানবজাতির মঙ্গলার্থে ক্রিয়া।[২৬]

এখন তিব্বতের ঐন্দ্রজালিক নৃত্য (মুখোশ) কিভাবে উত্তরবঙ্গের গৌড় অঞ্চলের (মালদহ) সঙ্গে সম্পর্কান্বিত তা দেখা প্রয়োজন। স্মরণীয় যে প্রাচীন-কালে তিব্বতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ও আসামের যোগাযোগ যে ছিল তার ঐতি-হাসিকতা স্বীকৃত। কামরূপ থেকে তিব্বত পর্যন্ত একটা দুর্গম গিরিপথ বেয়ে

মানুষ যে চলাচল করত সে সম্পর্কে অনেকেই নিঃসন্দিগ্ধ। নীহাররঞ্জন বলেছেন —'তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর একটা পার্বত্যপথ বোধহয় ছিল। এই পথ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম-ভোটান পার হইয়া হিমালয়ের গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়া তিব্বতের ভিতর দিয়া চীনদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রন্থে (প্রথম শতক) বোধ হয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশ হইতে যে রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথ বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া আসিত বলিয়া তো মনে হয়।'[২৭] তিব্বতের কৈলাস অঞ্চলের অনেক আচার ব্যবহার যে বাংলায় এসেছে সে সম্পর্কেও অনেক পর্যটক বলেছেন।[২৮] তিব্বতের শিল্প-রীতিতেও ভারতের প্রভাব আছে। তিব্বতী শিল্পে দুটি ধারা এসে মিলেছে ১. ভারতীয় রীতি ২. চৈনিক রীতি। তিব্বত কিন্তু পরিপূর্ণভাবে এই দুটিকেই গ্রহণ করেনি। ভারতীয় শিল্পরীতির মধ্যে কাশ্মিরী রীতি এবং বিশেষ করে বাংলার পাল ও সেনযুগের শিল্পরীতিকে গ্রহণ করে তাকে বিকশিত করেছিল নিজের মত করে। সেন ও পালরাজাদের জন্মভূমিতে তা পরবর্তীযুগে শুকিয়ে যায়।[২৯] কিন্তু তিব্বত শুধুমাত্র গ্রহণ করেছে এ মতবাদ মানা যায় না কারণ সমস্ত সংস্কৃতি দান ও গ্রহণে পুষ্ট হয়। বিশেষ করে যেহেতু ধর্ম ছাড়া তিব্বতী শিল্পকে সঠিক চেনা যায় না। এর মুখোশ শিল্পে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সঙ্গে ঐন্দ্র-জালিক ভাবানুসঙ্গের মিলন বর্তমান। মঙ্গোলয়েড সংস্কৃতি প্রভাবিত উত্তরপূর্ব-ভারতে যাদু ও তান্ত্রিকতার প্রভাবই অধিকতর। চট্টগ্রাম থেকে আসাম পর্যন্ত সমগ্র পূর্বাঞ্চলে মুখোশ ধারার ভাবগত সাদৃশ্য আছে একথা মানতেই হয়।

তিব্বতী লোকশিল্পে বিশেষ করে তার মুখোশ শিল্পের তিনটি ধারা আছে। সেগুলি ২. বৌদ্ধধর্ম ১. লোকধর্ম ৩. বন ধর্ম—অর্থাৎ যে পূর্ব প্রচলিত ধর্ম লামাধর্মে পর্যবসিত।[৩০] এরই সঙ্গে বোধ হয় সর্বপ্রাণবাদ যুক্ত হয়েছে। সুতরাং সঠিক ভাবে বললে বলা যায় তার ধর্মে এমন কি তার লোকরীতিতে লামা ধর্ম, যাদু, সর্বপ্রাণবাদ ও বৌদ্ধধর্ম যুক্ত হয়ে এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে।[৩১] লামাদের দানব পূজায় যাদু বর্তমান।

এক সময়ে ভারতের অধীনে থাকা বা প্রভাবিত অনেক দেশের শিল্পকলা, মুখোশ বা মুখোশ-নৃত্যে ভারতীয় প্রভাব লক্ষণীয়। কাম্বোডিয়া, জাভা, ব্রহ্মদেশ ও থাইদেশের একাংশ ও সর্বোপরি বালীতে ভারতের শিল্প জীবিত। ভারতে

এক সময় প্রাণহীন ও মুমূর্ষু হয়ে পড়লেও ঐ সমস্ত দেশে তা এখনও জীবিত। ভারতীয় শিল্প এমনকি তার মুখোশ শিল্প এখন অদ্ভুত চটকদার ভঙ্গীতে (Baroque Exaggeration) রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতের রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী স্থানীয় পুরাকাহিনী (myth)-র মাধ্যমে চিত্রিত। রামায়ণ কম্বোডিয়া ও থাইদেশে রামকিয়েন (Ramakien) বলে অভিহিত হয়েছে। বালী ও কম্বোডিয়ায় ভারতের প্রভাব পড়েছে তার মুখোশ শিল্পে পরিপূর্ণরূপে। যবদ্বীপ তার নিজস্ব রীতিতে এই শিল্পকে তৈরী করেছে। শুধু তারা নেয় নি। সুদূর জাপানের মুখোশকেও প্রভাবান্বিত করেছে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া বিশেষ করে সুমাত্রা এবং বোর্নিওতে ভারতের প্রভাব পড়েনি। ইন্দোনেশিয়া রীতি তার নিজস্ব রীতি ও অন্য কয়েকটি ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে পুষ্ট।[৩২]

তিব্বতী মুখোশ দু ধরণের। ব্যবহারও দু রকমে হয়। একটা মুখে পরার জন্য, অন্যটা নাট্যশালার জন্য। কতকগুলো মজাদার হাস্যোদ্রেককারী মুখের। তিব্বতীরা এগুলিকে ভারতীয় মুনি-ঋষিদের মুখোশ বলে অভিহিত করে।[৩৩] কিন্তু তা ঠিক নয়। আসলে এগুলো অধঃপতিত শিল্পকলার সাক্ষ্য বহন করে। হয়ত বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বা বৌদ্ধ লামাধর্মে বিশ্বাসীরা অসহিষ্ণু হয়ে ভারতীয় সাধুদের বিদ্রূপ করার জন্যই ওগুলো সৃষ্টি করেছে। মালদহের মুখোশ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কোন না কোন রকমে উত্তর-প্রান্তের মুখোশ যুক্ত, কারণ লোকনৃত্য তথা মুখোশ নৃত্য বিচ্ছিন্ন পরিবেশে নিজস্ব ঢঙের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে না। কোন না কোন ভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে তার যোগসূত্র থাকবেই। দূরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে কখনও বা যুক্ত হতে পারে, কারণ বিস্তৃতির গতিপথের মধ্যভাগ হয়ত কোন কারণে শুকিয়ে যেতে পারে।

এশিয়ার অন্যদেশগুলি অর্থাৎ কম্বোডিয়া, বালী, জাভা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশসমূহে এর প্রভাব পড়ে নি, মনে হয় উত্তর দিকের পথ দিয়ে তা তিব্বতে গিয়ে স্থান পেয়েছে। এ বিষয়ে তিব্বত, ভূটান, সিকিম ও মঙ্গোলিয়ার মুখোশের সঙ্গে আত্মিক যোগসূত্র বর্তমান। যদিও তিব্বত, ভূটান এবং সিকিমের মুখোশের ভারতের উত্তর প্রান্তের বিশেষ করে মালদহের (গৌড়) মুখোশের মিল আছে বটে। কিন্তু রীতিতে চৈনিক প্রভাব বেশী পড়েছে কারণ মঙ্গোলিয়ান মুখোশের প্রভাব স্বাভাবিক সূত্রে সেখানে পড়েছে।[৩৪]

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সিকিম ভূটান অপেক্ষা তিব্বতের সঙ্গে যে

ভারতের সম্পর্ক সব দিক থেকেই বেশী তা ইতিহাস সিদ্ধ, ভারতের বৌদ্ধধর্ম ও তার তান্ত্রিকতা যেমন এখানে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের প্রধান চরিত্র কালী, নারসিংহী, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, বাশুলী, ঝাঁটাকালী। গৃধিনীবিশাল ও মহিষমর্দ্দিনী পরবর্তীকালের যোজনা বলে মনে হয়। নৃত্যের মাঝখানে নৃত্যকারী মাতালের ন্যায় নৃত্য করতে থাকে এবং এক সময় একটি লোক পিছন থেকে কটিদেশ জড়িয়ে ধরে। নৃত্যবিদ্ মাতালের মত নাচতে নাচতে এক সময় শান্ত হয়। এটিকে "ভর" হওয়া বলে। এটীতে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস বা যাদু লক্ষণীয়। বাংলার অন্য প্রায় সব লোকনৃত্য আনন্দের জন্য। কিন্তু গম্ভীরার মুখোশ নৃত্য পরিপূর্ণ অতিপ্রাকৃত উপাদানের মোড়কে ঢাকা। পূর্ব্বভারতের উড়িষ্যার বেশ কিছু নাটকে তা দেখা যায়। যেমন 'প্রহ্লাদ নাটকের' ধর্মীয় আচরণ। এর নরসিংহ মুখোশ ভক্তির সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত মন্ত্রও উচ্চারণ করা হয় সেই সময়। বিশিষ্ট মুদ্রা ব্যবহৃত হয় নরসিংহের আবাহনে, সেই সময়ে যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা ঢোল ও করতাল বাজাতে থাকে। এক সময়ে সমস্ত নট ও গায়কেরা মুখোশের চারদিকে জড়ো হয়ে বিষ্ণুকে আহ্বান করতে থাকে। পুরোহিত-নট মুখোশের দিকে ফুল নিক্ষেপ করে, প্রদীপ ধরায় এবং আরতি করে।[৩৫] এই আচার গম্ভীরার শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ও মহিষমর্দ্দিনী নৃত্যে লক্ষণীয়।

উত্তর দিকের মুখোশনৃত্য কোন কাহিনীকে আশ্রয় করে উড়ে উঠতে পারে নি। তার একটা মাত্র কারণ এই যে গম্ভীরায় ধর্মীয় আচার-ই একমাত্র লক্ষ্য। তিব্বতের মুখোশেও এটা বর্তমান। উল্লেখ্য যে গম্ভীরার মুখোশ নৃত্যে শিব বা অন্য কোন দেবতা নেই। আদিম প্রভাবে শক্তিবাদের কথা প্রকারান্তরে তাই মনে পড়িয়ে দেয়।[৩৬] তিব্বতের বৌদ্ধতান্ত্রিকতার সঙ্গে স্বল্প আয়াসে সম্পর্ক রচনা করা তাই সম্ভব। পালরাজাদের আমলে গৌড়ে তন্ত্রের স্পর্শে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম রূপান্তরিত হতে থাকে।[৩৭] সেনরাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ও শক্তিতন্ত্র একাকার হয়ে যায়।[৩৮] এটিও লক্ষ্য করার বিষয়।

গম্ভীরার মুখোশগুলি আবার এত বৃহদাকার যে স্বেচ্ছাচারী উদ্দীপ্ত কল্পনার দ্বারা যে তারা সৃষ্ট তা স্বতঃই প্রতীয়মান। নারসিংহীর মুখোশ প্রায় ৩ ফুট। এটি তিব্বতী বৃহদায়তন মুখোশের অনুরূপ।[৩৯] অন্যত্র প্রাপ্ত মুখোশের চেহারা এত বড় নয়। আসলে এই মুখোশগুলি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়কে প্রকাশ করার জন্যই এত বৃহৎ করে দেখান হয়, যা প্রদীপ্ত অবাধ কল্পনার ফলশ্রুতি। তাই মুখোশের সঠিক সুষমতার অভাব লক্ষণীয়।

তবে গম্ভীরা মুখোশে তিব্বতের প্রভাব না তিব্বতের মুখোশে গম্ভীরার প্রভাব—তা নিরসন করা আপাতদৃষ্টিতে না গেলেও বাংলার রাজধানী গৌড়ের বিশেষ করে তন্ত্রের পথ বেয়ে উত্তরে তিব্বতে গিয়ে স্থান করে নিয়েছে এমন যুক্তি গ্রাহ্য হতে পারে।

সর্বশেষে একটা প্রশ্ন আছে। এই মুখোশনৃত্য কেবল মালদহ জেলার চৌহদ্দীতেই আবদ্ধ রইল কেন? পার্শ্ববর্তী উত্তরের দিনাজপুর জেলায় তার বিশেষ চিহ্ন রইল না কেন? যদিও দিনাজপুরের দু' একটি শিবপূজা গম্ভীরা নামে পরিচিত। পশ্চিম দিনাজপুরের মুখোশের (তপন, গঙ্গারামপুর, বংশীহারী থানায়) ধরন ভিন্নতর। তবে এ জেলার তপন থানার তেলিঘাটা, বাঙ্গারিয়া, গঙ্গারামপুর থানার সিংরাইল প্রভৃতি অঞ্চলে গম্ভীরাপূজা উপলক্ষে মড়ার মাথা নিয়ে নৃত্য হয়ে থাকে যেখানে তন্ত্র ও যাদুবিদ্যার সুস্পষ্ট ছাপ এখনও বর্তমান। উত্তরের জলপাইগুড়ি জেলায় 'মহীরাবণ বধ' ইত্যাদি রামায়ণ ভিত্তিক মুখোশ নৃত্যের মুখোশগুলি গম্ভীরার মুখোশের সমগোত্রীয়। এরই সঙ্গে 'মুখা খেইল'ও স্মরণীয়। সুতরাং উত্তরের দিকের পথটি খুঁজে নিতে অসুবিধে হয় না।

উত্তর দিকে তিব্বতে গিয়ে সে কেবল মাত্র ঐন্দ্রজালিক নৃত্যকে কেন্দ্র করেই বেঁচে রইল, আর মালদহ অঞ্চলে তা পুরাণের কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে চলতে লাগল। পরবর্তী পর্যায়ে লোকায়ত ভঙ্গীতে আরও কিছু নৃত্যকে (পরী, টাপা, হনুমান, মহিষ-রাখাল ইত্যাদি) সে একই ঢঙে গ্রহণ করল। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে সে গ্রহণ করেছে। বেশ কয়েক দশক ধরে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, হিরণ্যকশিপু বধ, সুধন্বা বধ ইত্যাদি নৃত্য যুক্ত করে সে কাহিনীকে ধরে মনোরম মুখোশ নৃত্যে পর্যবসিত হল। তার সিংহপদ-ব্যাঘ্রপদ ইত্যাদি লোকায়ত করণগুলি একই ভাবে রইল বেঁচে। তাই উৎসের নৃত্যরূপের সংযোজন ঘটেছে এবং ঘটছে, কিন্তু তার নৃত্যবৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নি। সে জন্য সে প্রাণবান ও চলিষ্ণু।[৪০]

১. Ghosh Prodyot—Gambhira : traditional Masked Dance of Bengal, Saugeet Natak, vol. 53-54.

২. Krappe. H. Alexandar—The Science of Folklore P. 303

৩. হালদার গোপাল—সংস্কৃতির রূপান্তর, পৃ-৩২

৪. Caudwell. C. Illusion and Reality. P-25

৫. ibid—35

৬. Krappe A.—ibid P. 304

৭. Parrinder Geoffrey—Witchcraft P. 121

৮. Encyclopaedia of world Art. vol IX. P 519-20

৯. Meria Bihalji Oto—Masks of the World, P-8

১০. Dall W. H.—On masks, liberts P-93

১১. Encyclopaedia of World Art. vol. IX. P-521

১২. Haigh A. E—The Tragic Drama of the Greeks P-29-68

১৩. ibid

১৪. Douglas Nik—Tantra Yoga P-2

১৫. ibid P-12-13

১৬. ibid—p. 2-3

১৭. Vedic Age (Race Movements) Bharatiya Vidya-Bhaban এবং বাঙ্গালীর ইতিহাস (ইতিহাসের গোড়ার কথা)—নীহাররঞ্জন রায়

১৮. ভট্টাচার্য গুরুদাস—বাংলা কাব্যে শিব, পৃ—৬৮

১৯. Dasgupta Sashibhusan—Obscure Religious cults.

২০. Wentz—Tibetan Yoga (Oxford)

২১. Chattopadhya Alaka—Atisha and Tibet, P-72

২২. পালিত হরিদাস—তদেব, পৃ-১৩৫

২৩. Bhattacharya Benoytosh—An Introduction to Sadhan-mala P-XIX

২৪. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—ভূমিকা, তন্ত্রতত্ত্ব 'শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, পৃ-১৬

২৫. Malinowski Bronishaw—Magic, Science and Religion P-70

২৬. Crow W. B—A history of magic, witchcraft and Occultism P-121

২৭. রায় নীহাররঞ্জন—বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব প্রথম, পৃ-২১৮

২৮. মুখোপাধ্যায় প্রমোদকুমার—হিমালয়ের পারে / কৈলাস ও মানস সরোবর

২৯. Encyclopaedia of World Art, vol, XIV P-67

৩০. Tucci Giuseppe—Tibet : Land of Snow (Ed. J. E Stapleton Driver) p-71

৩১. Collier's Encyclopaedia—20 vol, p-560

৩২. Lommel Andreas—Masks—Their meaning and Functions p-93

৩৩. ibid—p-96

৩৪. Lommel Andreas—Masks—Their meaning and Functions P-97

৩৫. Emigh John—Dealing with the Demonic : Strategies for containment in Hindu Iconography and performance, p-6

৩৬. Ghosh Prodyot—Gambhira : the traditional masked dance of Bengal, Sangeet Natak vol, 53-54

৩৭. Dasgupta Sashibhusan—An Introduction to Tantric Buddism (C. U) p-190

৩৮. Kern—Manual of Buddism, p-133

৩৯. Tucci Giuseppe—ibid p-140

৪০. ঘোষ প্রদ্যোত—লোকসংস্কৃতি ও মালদহের গম্ভীরা, মধুপর্ণী, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, পৃ-১৩৯

মুখোশ : গম্ভীরা-

প্রয়াত গুরুসদয় দত্ত তাঁর এক বিখ্যাত গ্রন্থে হ্যাভলক এলিস লিখিত এবং লিভিংষ্টোন কথিত একটা কৌতুককর ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। বাণ্টু জাতির বিভিন্ন শাখার লোকেরা পরস্পর সাক্ষাতের সময় যে প্রশ্নাবলী করে তার একটা সাধারণ প্রশ্ন—তুমি কোন নৃত্য কর?[১] অর্থাৎ নৃত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনকে ধরা যায়।[২]

আসলে নৃত্য আদিম যুগের সমগ্র জীবনকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। কারণ নৃত্য মানুষের আনন্দ প্রকাশের ফলশ্রুতি। আদিম মানুষ তার বুদ্ধি-চিন্তার বাইরের জগৎকে জয়ে ও যাদুবিদ্যার মাধ্যকে তার ঐহিক ঋদ্ধির চেষ্টায় ছিল সচেষ্ট। এই প্রচেষ্টাই নৃত্য উৎপত্তির অন্যতম কারণ।[৩]

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে লোকনৃত্য আদিম সমাজের পরবর্তী পর্যায়ের ফসল। কারণ আদিম সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তার উৎসব, অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত, শিল্পকর্ম প্রায় সবই একান্ত যাদু বিশ্বাস লালিত অথবা ব্যাপক পরিমাণে যাদু বিশ্বাস কেন্দ্রিক। লোক সমাজের শিল্পকর্মে যাদু বিশ্বাস বা ধর্মীয় বিশ্বাস যে নেই তা নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে তাকে অতিক্রম করে যাদু-বিশ্বাস বা ধর্মনিরপেক্ষ মানবীয় ভাবানুভূতি, আনন্দ ও সৌন্দর্যচেতনামূলক শৈল্পীক চারুত্ব প্রকাশের ঐকান্তিকতায় ধরা পড়ে। এটি ব্যাখ্যা করলে এমন দাঁড়ায় যে লোকসমাজ আদিম সমাজের অনেক পরের ধাপ। যেখানে তার ভাবনা-চিন্তার অগ্রগতি লক্ষণীয়। অন্য দিকে আদিম সমাজ পারতপক্ষে উপজাতীয় সমাজ। লোকসমাজে বহু উপজাতীয় উপাদান মিলেমিশে আদিম রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে এক সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করে এবং অনেক কিছু স্বাঙ্গীকরণ করে অনেক বেশী সংহত ও সমৃদ্ধ সমাজে রূপান্তরিত হয়। লোকসমাজ বিচিত্র ধারা থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পরিবর্তনের ধারায় প্রাণধারাকে পুষ্ট করে। এ সম্পর্কে ড. ভট্টাচার্যের মত প্রণিধান-যোগ্য—"স্বতন্ত্র সমাজকে আদিম সমাজ বলা যায়। কিন্তু লোকসাহিত্য যে

সমাজের সৃষ্টি তাহা আদিম সমাজের নহে, তাহা হইতে আরও অগ্রসর মানুষ।"[৪]

গম্ভীরার নৃত্যে একদিকে যেমন আদিম সমাজের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনি লোকসমাজের পূর্ণ প্রভাবও এখানে দেখা যায়। পূজা উপলক্ষে গম্ভীরা মুখোশনৃত্য তৈরী হয়েছিল লোকসমাজে। এখন তাকে পৃথক ভাবে বিচার করলেও পূজা অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত তার চরিত্র চিনে নিতে কষ্ট হয় না। বাণ, কালী, নারসিংহী, ইত্যাদি নৃত্যে দৈহিক নির্যাতনের মধ্যে দেবদেবীর প্রসাদ পুষ্ট হওয়ার ঐকান্তিকতা বর্তমান।

পৃথিবীর অধিকাংশ নৃত্যের উৎসে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।[৫] এ সম্পর্কে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহু মনীষী আলোচনাও করেছেন। সকলে একমতও নন। কিন্তু প্রাচ্যে ধর্মের সংজ্ঞা সমাজ তত্ত্ব ও নৃতত্ত্ববিদ্যার আলোকে আলোচিত হয় নি।[৬]

একটা বিষয় আমরা বহুবার আলোচনা করে দেখেছি যে আদিমসমাজের জীবনের দশদিকের অধিকাংশ জীবনাচরণে যাদুবিশ্বাসই পরিস্ফুট। যা তার আদিম ধর্মেরই এক প্রকাশ। কিন্তু লোকসমাজের জীবন যাদুবিশ্বাস পূর্ণরূপে গ্রাস করেনি। কারণ শ্রেণী বিভক্ত লোকসমাজে মিশ্রলক্ষণ দেখা দেবে এটা স্বাভাবিক।

আদিম বিশ্বাস ধর্মবিশ্বাস বা রিলিজিয়নের মেলবন্ধনে প্রকাশমান হলেও লৌকিক ধর্মের জন্য অপার্থিব অধ্যাত্মবেদনা ও পারত্রিক কামনা বড় হয়ে ওঠেনি, কারণ এখানে মানুষ বড়। মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করেই তার দুঃখ-সুখ, আনন্দ-কান্না-হাসি, বিরহ-মিলনের প্রেক্ষাপটে তার ধর্ম স্থাপিত হয়েছে। যদিও আদিযুগের পূজার পরিকল্পনা বর্তমান। এখানে আদিমযুগের ধারনা রইলেও তা আর মুখ্যস্থান অধিকার করে নেই। সামাজিক জীবনে সকলের মিলনের স্থান এই পূজা ও উৎসব এবং তাকে কেন্দ্র করেই লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত।

অতএব এই লৌকিক ধর্মভাবনার প্রেক্ষাপট ভাদু, টুসু প্রভৃতি বাংলার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য গম্ভীরার ক্ষেত্রে।

গম্ভীরা পূজা আদিতে চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং তার আগের তিনদিনে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটিকে লৌকিক সূর্যোৎসব হিসেবে গণ্য করা যে যায় তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

বৎসরান্তে বৃষ্টিকামনা তথা শস্যকামনা সূত্রে গম্ভীরাকে আদিম সূর্যপূজার লৌকিক উৎসবই এর সঙ্গে জড়িত বলে মনে করা সঙ্গত। আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে আদিমযুগে ঋতুর পালাবদলে খাদ্যশস্যের যাওয়া-আসাকে কেন্দ্র করে নৃত্যগীত অনুষ্ঠান উৎসবের সূচনা হত।[৯]

তাই গম্ভীরা মুখোশনৃত্যেকে সেই নৃত্য ধারারই একটি বিশিষ্ট রূপ বলে ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয়।

এবার আমরা গম্ভীরার মুখোশ সম্পর্কে আলোচনা করবো। যদিও পূর্ববর্তী পর্যায়ে আমরা সামগ্রিকভাবে মুখোশের প্রেক্ষাপটে গম্ভীরা মুখোশকে স্থাপন করেছি।

গম্ভীরার মুখোশ আদিতে সমস্তই ছিল নিম বা ডুমুর কাঠ দিয়ে। এখন মাটি বা শোলা দিয়েও কোথাও কোথাও তৈরী হয়। সম্প্রতি আইহো গ্রামে কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী করছে শিল্পী তুলসী পাল ও মণ্টু পাল। তবে পুরুলিয়ার ছৌ মুখোশ শিল্পের মত মালদহের মুখোশের ব্যাপক বাজার তৈরী হয়নি। অধিকাংশ নৃত্যবিদেরা নিজেরা মুখা বা মুখোশ করিয়ে নেয়।
গম্ভীরাব মুখোশ নৃত্যের দুটি ভাগ ১. মুখোশ যুক্ত ২. মুখোশ হীন।

এতাবৎকাল পর্যন্ত প্রচলিত গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যগুলি বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ভাগ করা চলে।[৭]

১. পৌরাণিক—বাণ. কালী, নারসিংহী, বাশুলী, গৃধিনীবিশাল, চামুণ্ডা, উগ্রচণ্ডা, ঝাঁটাকালী, মহিষমর্দিনী, কার্তিক, গণেশ,হনুমান, লক্ষ্মী-সরস্বতী, রাধা-কৃষ্ণ, রাম-লক্ষ্মণ, শিব-দুর্গা, হিরণ্যকশিপু বধ, তারকাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, সাবিত্রী-সত্যবান, সুধন্বা বধ।

২. গ্রামীণ বা লোকায়ত—বক, টাপা, গরুর দুধ দোহা, কলসী কাঁখে বধু, সাঁওতাল, মহিষ-রাখাল, চাষা-চাষী,

৩. প্রাণী-সম্পর্কিত—সর্প, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হরিণ, হনুমান,

৪. সামাজিক—মাতাল, মেমসাহেব, বুড়া-বুড়ি

৫. মিশ্র বা অন্যান্য—পইরী (পরী), বংশ, রণপা, শব, যাদুকর, ভূত-পেত্নী, চালি

এবার কয়েকটি নৃত্যেব সংক্ষিপ্ত পবিচয দেওয়া হচ্ছে। সব নৃত্যেই বাদ্যযন্ত্র ঢাক ও কাঁসি। ঢাকীদের বলে ঢাকী বা ঢাকুয়া বা ঢেকে।

১. বাণ/ সব নৃত্যের ভূমিকা এই বাণনৃত্য। একসঙ্গে অনেকে এ নৃত্যে অংশ-গ্রহণ করে। ত্রিশূলের মত সওয়া একহাত বা দেড়হাত দু'খানা লোহার তীক্ষ্ণ বাণ প্রয়োজন। পবিত্রবেশে শুদ্ধ হয়ে মন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে বাণদুটি কোমরের দুধারে সামান্য চামড়ার মধ্যে বিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অনেকে আবার কোমরের পরিধেয় বস্ত্রের উপরও বিদ্ধ করে নেয় এবং সকলেই বাণের দুদিকের দুটি মাথা লোহার তার দিয়ে বেঁধে নেয়। তারপর সরষের তেলে ভেজা নেকড়া ওর মাথায় জড়িয়ে আগুন লাগিয়ে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করতে থাকে। প্রতিটি গম্ভীরামণ্ডপ থেকে নৃত্য-বিদেরা নৃত্য করতে করতে গ্রামের সবকটি মণ্ডপেও বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে। এ নৃত্যে যারা অংশগ্রহণ করে তারা সেদিন মাছ, মাংস, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি আমিষ গ্রহণ করে না। নখ কাটে ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে তার আগের দিন থেকে।

২. কালী/ গম্ভীরা উৎসবের কালীনৃত্য ভিন্ন আঙ্গিকে হয়ে থাকে। এখন পরনে ঘাঘরা কখনও বা পাজামার মত বেশ। কটিদেশ থেকে সাদা বা লাল কাপড়ের টুকরো দিয়ে নরহস্ত তৈরী হয়, উপরের বস্ত্র কালো রঙের, গলায় মুণ্ডমালা কাপড়ের তৈরী। নারসিংহী নৃত্যের সঙ্গে এর নৃত্যাঙ্গিক কিছুটা মেলে। এর গতি প্রথমে ধীর, দক্ষিণহস্ত কখনও বা নিম্নে স্থাপন করে। অনেকটা থালা নিয়ে নৃত্যের ভঙ্গী। দক্ষিণা কালী বা শ্মশানকালীর মুখোশে কিছুক্ষণ ধীর লয়ে নৃত্যের পর নৃত্য উদ্দাম হয়, ঢাকের বোল ও হয় দ্রুত, তখন নৃত্যকারীর পর দেবীর ভর হয় বলে বিশ্বাস। পোড়ান ধূপের গন্ধ শোঁকান হয়। কোন এক ব্যক্তি পিছন থেকে নৃত্যকারীর কটিদেশ সজোরে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ মোহাবিষ্টের মত নৃত্য করতে থাকে, পরে নৃত্যকারী শান্ত হয়। ঢাক বেজে ওঠে—

গুড় গুড় গুড় গুড়…
ধিঃ নাঃ ধিং ত্রাং
তিনাক্ নাতিন্ তিনাক্ ঝিঝিং ঝিনা
নাক্ তিনা তিন্
নাক্ তিনা তিন্ তিনা।…
ত্রাং নাতিং ত্রাং।

ঢাকের বোলের গতি-ছন্দ ও তালের সঙ্গে চলে বিভিন্ন ভঙ্গীতে কালীর

নৃত্য। সুরু হয় ধীর লয়ে, মধ্যের লয় মধ্যম, শেষ হয় উদ্দাম গতিতে দ্রুত লয়ে। নৃত্যকারীদের সিংহপদ, ব্যাঘ্রপদ লক্ষণীয়,

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এখনকার কালী নৃত্যের পোষাক কিন্তু পূর্বযুগের মতন নয়। আগে কালীর মুণ্ডমালা বা কটি দেশে নরহস্ত ছিল না। মণিপুরী নৃত্যের বেশের ঢঙে তাদের সজ্জা ছিল। বাঁশের বাখারী দিয়ে গোল করে একটা কাঠামো কোমর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। তারপর লাল কাপড় জড়িয়ে সাদা কাপড়ের নক্সা তৈরী হত। কোমরে দড়ি বেঁধে সেটি ঝুলিয়ে দেওয়া হত, উপরে কালো কাঁচুলি, মুখে মুখোশ। কিন্তু এখন পরিধানে পাজামার ন্যায় চোস্ত,উপরেও পূর্ণহাতা জামা। নরহস্তও কাপড়ে তৈরী, কোথাও বা মাটির তৈরী। কালী ও পরী নৃত্যের এক-স্থানে মিল বর্ত্তমান। দু স্থানেই খেমটা, আড-খেমটা, চৌতাল, দশ কোশী, গৃধিনী বিশাল, ডাঘঘা-পোস্তা, ভুমনি কাহারুবা বর্তমান।

৩. নারসিংহী/ এটি একক নৃত্য। কালীনৃত্যের সঙ্গে মিল বর্তমান। ১০/১৫ মিনিট চলে নানা ভঙ্গিতে, কখনও একেবারে স্থাণুবৎ, তর্জনী বিশিষ্ট দিকে হেলন করে, কখনও শুয়ে, কখনও বা উদ্দাম রূপে এ নৃত্য রূপ পায়। কখনও ভ্রামরীতে ঘোরে, কখন এগিয়ে, কখনও বিশেষ 'স্থানকে' ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ায় নর্তক। আগেই উল্লেখ করেছি যে গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুখোশ এই নাবসিংহীর এবং সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। সমগ্র বাংলায় এই বৈশিষ্ট্য অন্যকোন মুখোশে নেই। অনেকে এটিকে নরসিংহ বা নৃসিংহ বলে থাকেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়, কাবণ চণ্ডীর এক মূর্তি নারসিংহী। নারসিংহী ধ্যান ও প্রণাম এ বিষয়ে উল্লেখ্য—

ক, ওঁ সুরবেশা বালোন্তিনা নানাভরণভূষিতা।
ভিন্দন্তী কশিপোর্ব্বক্ষো নারসিংহীতি বিশ্রুতা ।।

(অর্থ—ঈষদুদ্ভিভিন্ন যৌবনা, নানালঙ্কারমণ্ডিতা, হিরণ্যকশিপুর বক্ষোবিদারণ-কারিনী দেবী নারসিংহীরূপে প্রসিদ্ধা)

খ. ওঁ নরসিংহরূপিনীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং।
শুভদাং সুপ্রভাং নিত্যাং নারসিংহীং নমাম্যহং ।।

(অর্থ—নরসিংহরূপধারিনী, দৈত্য ও দানবদিগের দর্পনাশিনী শুভদায়িনী,

অতিশয় প্রভাবতী, অক্ষয়স্বরূপা, নারসিংহী দেবীকে প্রণাম জানাই)

হিরণ্যকশিপুকে বিষ্ণু নরসিংহ রূপে বধ করেছিলেন, কিন্তু এখানে শক্তিভাবনায় তাঁকে নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে এটি লক্ষ্য করার বিষয়। মুখোশে গোঁফও বোধহয় পরবর্তীকালের যোজনা।

৪. চামুণ্ডা/ চামুণ্ডার মুখোশ কালীর ন্যায়, কেবল মুখের রঙ লাল। নর্তক হাতে খর্পর ও পাবাবতাদি ধারণ করে উদ্দামনৃত্য করে। সুরু হয় ধীর লয়ে পরে বিলম্বিত হয়ে শেষ হয় দ্রুত লয়ে।

৫. শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ/ এখানে নৃত্যনাট্যের ঢঙে কাহিনী গ্রথিত। মোট পাঁচটি চরিত্র এ নৃত্যে। অসুর শুম্ভ-নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয়, কালিকা, চণ্ডিকা ও মহাদেব। অসুর সম্রাট শুম্ভ ও নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয়ের অত্যাচারে জর্জরিত দেবতারা আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করায় দেবীর শরীর থেকে কৌশিকী আবির্ভূত হন। ভগবতী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন—তিনি হন কালিকা-দেবী। কালী ও চণ্ডিকা শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করেন।

৬. পইরী বা পরী/ বাঁশের উপর তুলো দিয়ে যে কৃত্রিম পাখা তৈরী হয় তা দুহাতের পিছনে বেঁধে নৃত্য করে একজন বা দু জন। ঘাঘরা পরে হাতে রুমাল নিয়ে প্রবেশ করে নৃত্যবিদেরা। নর্তক পদোগ্রতলে ভর দিয়ে নৃত্য সুরু করে। মনে হয় তারা উড়ে আসছে। পক্ষী সুলভ ভঙ্গী চলে। কটিকর্মে চলে পরীদের নৃত্য। বাইজী নৃত্যের ঢঙ লক্ষণীয়।

গুড়-গুড়-গুড় ..

ধিং না কিত্তা ধিধি না…২।৩ বার

ধিন্ ধিন্ ধিন্…

পোস্তা—তিং না, ধিন্ ধিনা ধিং

ধিং ধিং ধি· ধিং ধিং

৭. ধাপা/ জেলেরা স্বল্প জলে মাছ ধরার জন্য এক ধরনের বাঁশের তৈরী ঝুড়ি তৈরী করে—তাকে বলে টাপা বা পলো। মাছ ধরার চিত্রটি দুজন নৃত্যবিদের নৃত্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট। লোকায়ত জীবনের রূপটির চেহারা মনোরম। একজন টাপা নিয়ে ও অন্যজন ডোলা বা মাছ রাখার ঝুড়ি নিয়ে চলে। মাছ পালানোয় নৈরাশ্য, পাওয়ায় আনন্দ। মাছ

ধরার সময় উৎসাহ, চাঞ্চল্য, নৈরাশ্য, সজাগ দৃষ্টি, সতর্কতা প্রভৃতি ভঙ্গিমা অনবদ্য মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। এটি মুখোশ বিহীন বটে কিন্তু ভঙ্গিমায় তারা মুখোশনৃত্যেরই অন্তর্গত।

৮. চালি/ দুর্গাপ্রতিমার পশ্চাদদেশে যে প্রথাগত চালচিত্র দেখা যায়, সেই রকম ছোট একটা চালিকে সুন্দর করে সজ্জিত করা হয়। একজন নর্তক নিজের কটিদেশে সেটিকে বেঁধে ছোট এক বা একাধিক ছেলে-মেয়েকে তার উপরে বসিয়ে দুহাত দিয়ে পিছন দিক থেকে ধরে নৃত্য করে।

৯. ভল্লুক/ ভল্লুকের মুখা পরিধান করে নর্তক কাল রঙের পাট বা শনের চুল দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে। ভুষোকালি ও তেল দিয়ে ঐ কালো রঙ তৈরী হয়। এক জন সেই ভল্লুককে নাচায়।

১০. তারকাসুর/ এই নৃত্যনাট্যের চরিত্র পাঁচটি। দেবতা বিদ্বেষী অসুর-তারকের অত্যাচারে অতিশয় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন দেবতারা। কৃত্তিকাগণের স্নেহচ্ছায়ায় মহাদেবের পুত্র কার্তিকেয় বর্ধিত হলে তিনি দেব-সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়ে তারককে বধ করেন।

১১. হিরণ্যকশিপু বধ/ চরিত্র চার, নৃত্যনাট্য। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুর সম্রাট হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ নির্যাতিত হতে থাকলে ভক্তের রক্ষার্থে বিষ্ণু নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

১২. সাবিত্রী-সত্যবান কাহিনী/ মহাভারত ও পুরাণের এই বিশ্রুত কাহিনী লোক-নৃত্যনাট্যের মধ্যে পরিস্ফুট। পাঁচটি চরিত্র—সাবিত্রী, সত্যবান, যমদূতদ্বয় ও যমরাজ।

১৩. বক/ এটি একটি বিচিত্র মনোগ্রাহী নৃত্য। কাপড়ে ঢাকা বৃহৎ টাপার মধ্যে নর্তক বসে হাতটিকে টাপার মুখ দিয়ে বের করে দেয়। হাতটি সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকে। দু আঙুলে কাগজের বকের ঠোঁট। খালে বিলে বকের মাছ ধরার চিত্র অত্যন্ত সার্থক ভাবে চিত্রিত। এটি একক নৃত্য।

১৪. শিব-দুর্গা/ সাধারণতঃ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এ নৃত্য করে। মিনিট পাঁচেক ধরে এ নৃত্য।

১৫. রাম-লক্ষ্মণ/ একটি তালের উপরেই এ নৃত্য।

১৬. গৃধিনী বিশাল/ গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের এ রূপ বোলান গাজন উৎসবের গৃধিনী বিশালেরই সমতুল। একটা কৃত্রিম শ্মশান কল্পিত হয়।

সেখানকার শব-ভক্ষণরত গৃধিনীর কর্মেরই রূপায়ন এ নৃত্য। মাঝখানে মড়ার খুলি রেখে (এ প্রথা এখন আর নেই) নর্তকেরা অঙ্গ-ভঙ্গিতে সমবেত ভাবে নৃত্যাভিনয়ে তার রূপটি পরিস্ফুট করে। মনে হয় দলবদ্ধ ভাবে শ্মশানে গলিত শবের মাংস চঞ্চু দ্বারা ছিঁড়ে খাচ্ছে, ডানা ঝাপটিয়ে চক্রাকারে উড্ডীয়মান ভঙ্গিতে দুরন্ত গতি নিয়ে নৃত্য করেছে। এখানে তান্ত্রিক চরিত্রটি বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট।

১৭. কলসী/ ছোট বড় সকলেই মেয়ে সেজে কলসী নিয়ে নৃত্য করে। শিব-দুর্গার মতই ঢঙ।

১৮. ঘোড়া/ বাঁশের বাখারীর সাহায্যে রঙীন কাগজের একটা ঘোড়ার মধ্যে নৃত্যবিদ প্রবেশ করতে পারে। কটিদেশে গ্রীবাসহ ঘোড়ার মুখোশ এঁটে চলে এ নৃত্য। চরিত্র দুটি। একজন আরোহী, অন্যজন সহিস সেজে ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। বয়স্ক ও ছোটরা নিজেদের সুবিধেমত ঘোড়া ছোট-বড় করে। এ নৃত্য ৭।৮ মিনিট ধরে চলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ভারতের প্রায় প্রতি প্রদেশে ঘোড়া-নৃত্য বর্তমান। উড়িষ্যার এ নৃত্যে গানও আছে। বাজে ঢাক ঢোলকের সুরে—

খাট্টা মাট্টা লাগা ডুম

ত্রিং ত্রিং দিং দিদিং নিং-চলে লাফিয়ে এ নৃত্য।

১৯. মাতাল/ পানাসক্ত অবস্থায় স্খলিত চরণে এ নৃত্যে খেমটার রীতি লক্ষণীয়।

২০. বুড়া-বুড়ী / বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার হাস্যরসাত্মক ভঙ্গীতে এ নৃত্য চলে। বাজে—

ধিনাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ ধিনাক্ দিদিং

ধিন্নাক্ তিং তিনা

তিনাক্ তিনাক্ তিনাক্ তিনাক্ দিদিং

তিন্নাক তিং তিনা।

২১. মহিষ-রাখাল/ দুজনে নৃত্য করে, মহিষের মুখোশ পরিধান করে একজন। এ মুখোশের শিং টিন দিয়ে তৈরী হয়। কাঠের মুখোশগুলোতে যাতে নৃত্যকারীর অসুবিধা না হয় তারজন্যে কাপড় জড়িয়ে নেওয়া হয় মুখে, তারপর মুখোশের দড়ি বাঁধা হয়। মহিষের সঙ্গে রাখালের শত্রুতাই এই নৃত্যে লক্ষণীয়। রাখালের হাতে থাকে লাঠি। রাখালের মুখোশ নেই।

এবার যন্ত্র সঙ্গীতের কথা বলা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে এ নৃত্যের অনুসঙ্গী ঢাক ও কাঁসি। গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যের প্রধান প্রধান বিষয়ের ঢাকের বোল মুখ্যতঃ পাঁচ প্রকার। একে বলে সূত্র। প্রথম – আহ্বান, দ্বিতীয়—পুজাবাদ্য, তৃতীয়—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালন, চতুর্থ—লহরা, পঞ্চম—বিদায়। এই পঞ্চসূত্র কালী, চামুণ্ডা, নারসিংহী, বাশুলী, উগ্রচণ্ডা বা ভয়ঙ্করা, গৃধিনীবিশাল ও মহিষমর্দিনী এই সাতপ্রকার নৃত্যে প্রকাশ। পরে প্রথম 'ল', দ্বিতীয় 'পরণ' ও তৃতীয় 'বিদায়বাদ্য' বাজিয়ে নৃত্য শেষ হয়। নৃত্যের আবার বিভাগ দুটি। একটি পৌরাণিক নৃত্য, এটির মধ্যে 'বাণ' অন্যতম। মাধ্যমিক নৃত্য বলতে বোঝায়—ঝাঁটাকালী, শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, বুড়া-বুড়ি, ঘোড়া, সর্প, ব্যাঘ্র, ভালুক, টাপা, মাতাল, যাদুকর, মেমসাহেব, হনুমান, গণ্ডার, বোতল, খেমটা ইত্যাদি নৃত্য।[৯] নর্তকদের পায়ে আগে ছিল নূপুর, এখন অভাবে ঘুঙুর। চারিত্রিক দিক থেকে গম্ভীরা মুখোশ নৃত্যকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১, সাধারণ ২, ঐন্দ্রজালিক ৩, লোকায়ত। পইরী (পরী), ভল্লুক, ব্যাঘ্র, হনুমান ইত্যাদি প্রথম, কালী, নারসিংহী, চামুণ্ডা, গৃধিনী বিশাল প্রভৃতি দ্বিতীয় ও টাপা, বক, চাষা-চাষী, মহিষ-রাখাল প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব নির্দিষ্ট বাঁধা বোল এখনও চলছে। আবার কোন কোন সময় ঢাকীকে ঠকাবার জন্য নর্তকেরা নানাধরনের অদ্ভুত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নৃত্য করতে থাকে। ঢাকীরা বাজাতে না পারলে নিন্দা হয়।

এবার কয়েকটি নৃত্যের বোল দেওয়া হচ্ছে।[১০]

১. কালীনৃত্য / আবাহন—ধিং ধিং, ধিধিং নাতিং, ধিনধিনা তিং, ধিধিং নাতিং, ধিংনা ধিংনা ধিধিং নাতিং ধিং ধিনাধিং ধিধিং ধিনা ধিনা ধিধিং।

পূজা—(ধূপ ধুনা দেওয়া হয় ও পূজা) ধিং ধিনা ধিনাক ধিধিং ধিং ধিনা তিং নাতিং, নাতিং ধিনাক্ ধিধিং ধিং নাতিং নাতিং নাতিং নাতিং তিনাক্।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালন – ধিং ধিনা ধিং তিনাক্ ধিধিং…

লহরা—পূর্ব্বের বাজনা-অতিক্রত

বিদায়বাদ্য—ধিংধিং ধিনাক্, ধিধিং ধিনাক্ ধিং, গুড় গুড় গুড়
গুড় ধিং, গুড় গুড় গুড় গুড় ধিং, তিনাক্ তিনাক্
তিনা তিং

২. চামুণ্ডা নৃত্য/আবাহন—কালী নৃত্যের অনুরূপ

পূজা—ধিং ধিনাধিং ধিধিং ধিনা, ধিধিং নাতিং তিনা
গুড় গুড় গুড় গুড়, ধিধিং ধিনাক্, ধিং ধিং ধিং
নাতিং তিনা।

লহরা—পূর্ব্ব বাদ্য অতিক্রুত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালন—ধিংনা তিং ধিং নাতিং, ধিংনা তিং ধিং নাতিং,
তিং ধিং নাতিং।

বিদায়বাদ্য—ধিং ধিনা ধিং ধিনাক্ ধিধিং ধিধিং ধিনা ধিং ধিনা
ধিধিং।

৩. নারসিংহীনৃত্য/আবাহন – কালীনৃত্যের ন্যায়

পূজাবাদ্য—গুড় গুড় গুড় এবং ধিনা ধিং ত্রাং ধিনা তিং ধিনা,
গুড় গুড় (বারো বার)···
ধিক ধিনাক্ ধিং ধিং ধিং নাতিং নাতিং গুড় গুড়
(ছ বার)
ধিং ধিনা ধিং ধিধিং ধিনা ধিধিং।

লহরা – পূর্ব্ববাদ্য অতিক্রুত

বিদায়—ধিধিং ধিনা ধিনাক্ ধিধিং তিতিং, ধিনা তিং
ধিনা – ধিনাতিং (এগার বার)
ধিং ধিনাধিং ধিধিং ধিনা ধিধিং।

৪. বাশুলীনৃত্য/আবাহন—ধিংনা ধিংনাধিং ধিধিং ধিং ধিনাধিং ধিধিং ধিনা
ধিধিং।

পূজা—ধিধিং ধিধিং ধিনাক্ ধিধিং নাকুড়, ধিধিং ধিনা
নাতিং ধিং নাতিং ধিনাক্। (জলদ)
ধি ধিনাক ধিং ধিং ধিং নাতিং নাতিং, গুড় গুড়
(সাত বার)
ধিং ধিনা ধিং ধিধিং ধিনা ধিধিং

লহরা—পূর্ব্ববাদ্য অতিক্রুত

বিদায়—ধিং ধিং (সাত বার) ধিনা, গুড় গুড় গুড় ত্রাং
ধিনা তিং ধিনা।

৫. উগ্রচণ্ডা নৃত্য / আবাহন—পূর্ববৎ

পূজা—ধিধিং ধিনাক্ ধিধিং তিনা তিং ধিধিং ধিং
গুড় গুড়···বেশ কিছুক্ষণ চলবে।

লহরা—ঐ দ্রুত

বিদায়—ধিং ধিনা ধিং তিনাক ধিধিং (১২ বার চলার
পর) ধিং ধিনা ধিং ত্রাং ধিনা ধিং ধিধিং
ধিনা ধিধিং

৬. গৃধিনীবিশাল নৃত্য / প্রথমে গুড় গুড় শব্দ ১২ বার। পরে

আবাহন / ধিং ধিং (ছ'বার) তিনাক্ তিনাক্
২০ বার, গুড় গুড় (বারো বার) পরে
ধিং তিনা তিনা তিং ধিং তিনা তিনা তিং
ধিং তিনা তিনা তিং, তিং তিনা তিং গুড়
গুড় শব্দ (বারো বার), তিনাক তিং
(কুড়ি বার), গুড় গুড় শব্দ (বারো বার),
ধিং ধিনাধিং ধিং ধিনা ধিং ধিধিং (আগের
বোলগুলির পুনরাবর্তন)

লহবা—গুড় গুড় শব্দ ৩০ বার (অতি দ্রুত)

বিদায়—তিং নাতিং তিং নাতিং নাতিং তিন
(আট বার)

৭. মহিষমর্দিনী নৃত্য / আবাহন—ধিং নাতিং নাক ধিনা ধিং নাতিং না
(অতিদ্রুত কিছুক্ষণ)

যুদ্ধবাদ্য—ধিনাধিং ত্রাং ধিনাধিং ত্রাং (কুড়িবার
অতিদ্রুত)

(কিছুক্ষণ পরে) বিদায়বাদ্য—ধিং ধিনাধিং ধিধিং
ধিধিং ধিনা ধিধিং

৮. বাণনৃত্য / আবাহন—ধিং ধিং তিনা তিং ধিধিং তিনা ধিধিং ধিক্
ধিনা তিং ধিনা গুড় গুড় (আটবার) ধিং ধিনা তিং
তিনাক্ ধিধিং নাতিং তিনা।

লহরা—ঐ দ্রুত

বিদায়—ধিং .না ধিনাতিং ধিধিং নাতিং তিনাধিং

তিনাধিং ধিধিং।

৯. ঝাঁটাকালী নৃত্য / আবাহন—ধিধিং ধিধিং ধিধিং ধিনা নাতিং

(তিনবার) পরে

নাক্ তিনা তিং (তিনবার)

নাক্ তিনা তিং নাক্ তিনাতিং

তিনা তিং গুড় গুড় (চারবার)

ধিং তিনা তিং তিং কুটী তিং

তিনি কুটী তিং

লহরা / ঐ দ্রুত

বিদায় / ধিং ধিধিং ধিং ধিধিং

ধিং ধিধিং গুড গুড (চারবাব)

তিং ধিধিং ধিং ধিনা ধিং

মালদহের গম্ভীরার মুখোশনৃত্য ছাড়া ঢাকেব এই বিচিত্র বোল আর কোথাও শোনা যায় না। ঢাকীরা জাতিতে ঋষি (চর্মকার)। বংশপরম্পরায় তারা ঢাক বাজিয়ে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে। বিখ্যাত ঢাকীদের যে নাম সংগ্রহ করা গেছে তাদের মধ্যে আগের দিনের নবাবগঞ্জের খগেন ঋষি, শিবগঞ্জ থানার কৈলাস রবিদাস, ফুলবাড়ীর হরিপদ রবিদাস, পরাণপুরের ঝাড়ু রবিদাস, গোমস্তাপুরের বাঙ্গাবাড়ীর ফকিরচন্দ্র রবিদাস ও সুজাপুরের মহেন্দ্র ঋষির নাম উল্লেখযোগ্য। একালে মুচিয়ার গিরিশ রবিদাস ও আইহোর জগন্নাথ রবিদাস ও রঘু রবিদাস (ভ্রাতৃদ্বয়) উল্লেখযোগ্য। অধুনাকালের নৃত্যশিল্পী হিসেবে সারা মালদহের শ্রেষ্ঠ—আইহোর বৈদ্যনাথ হালদার এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অশ্বিনী সাহা, তুলসী পাল, মণ্টু পাল, সিদ্দিক সেখ, নিশীথ দাস, সুদাম দাস, হরিপদ ঘোষ, গুরুপদ ঘোষ ও সনাতন দাস।

উপসংহারে বলা যায় যে পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে এ মুখোশনৃত্য জন্মলাভ করলেও লোকায়ত বিষয়বস্তু গ্রহণে আজ অনেকক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষ চৌহদ্দী সৃষ্টি করেছে।[১১]

১. Ellis Havlock—The Dance of life, ch. II Sec II

২. Dutta Gurusaday—The folk dances of Bengal. p-1

৩. Encyclopaedia Britannica—vol. 9. p-437

৪. ভট্টাচার্য আশুতোষ—বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম, ২য় সং, পৃ-২

৫. Encyclopaedia Britannica—vol. 5. p-418.

৬. cf. Dasgupta Sashibhusan—Obscure Religious cults, Dasgupta S. N.—History of Indian Philosophy (Camb), Harrison J. E—Ancient Art and Ritual, চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র—ধর্মতত্ত্ব, Comstock Richard W. B.—The Study of Religion and Primitive Religion, Chatterjee Suniti Kumar.—The Cultural Heritage of India, vol. 1, Frazer, J. G—The Golden Bough (Abridged Edition),

৩

গম্ভীরা গান

এ পরিচ্ছেদে গম্ভীরা গানের আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ এখন গম্ভীরা গানই আদরনীয় তার জেলার চৌহদ্দীর বাইরেও। পূজার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেও পরবর্তী পর্যায়ে সে পূজার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে।

গম্ভীরা গানের ঢঙ যাত্রার। অনেক লোকগীতিতে অবশ্য যাত্রার স্পষ্ট প্রভাব

ময়মনসিংহ গীতিকা, মনসার ভাসান ইত্যাদি গম্ভীরার দোসর। কোনটি অগ্রজ, এ বিচার করা কঠিন। তবে গম্ভীরার এই যাত্রার ঢঙও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই ঘটেছে বলে ময়মনসিংহ গীতিকা, মনসার ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি তাকে প্রভাবিত করেছে—একথা বলা যায় নিঃসন্দেহে।

এবার গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানেব চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

১২। ১৪। ১৬ ফুটের মত অংশ গোল করে ছেড়ে দিয়ে দর্শকেরা মাটিতে বসে। সামনের দিকে স্বভাবতঃই শিশু-বালক-বালিকারা থাকে। সেই ছেড়ে দেওয়া অংশে অনুষ্ঠান হয়। ওপরে সামিয়ানা বা অন্য কোন আচ্ছাদন (ইদানীংকালে ত্রিপল জাতীয় জিনিস ব্যবহৃত হয়) দেওয়া হয়। একটু দূবে গ্রীণরুম বা সাজঘর থাকে কোন বাড়ীতে বা অস্থায়ী ঘেরা জায়গায়। খালি অংশটির একপাশে থাকে বাদক ও গায়কেরা। এখানকার বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, বাঁশী ও জুড়ি। আদিযুগে ছিল কেবলমাত্র ছিল ঢোল ও কাঁশি। তার পবরর্তী পর্যায়ে ঢোলের সঙ্গে হারমোনিয়াম, ডুগী-তবলা ও মন্দিরা এসেছে।

একটা গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানের কয়েকটা অংশ আছে যেমন—মুখপাদ,বন্দনা, ডুয়েট বা দ্বৈত, চারইয়ারী, পালাবন্দী গান, খবর বা রিপোর্ট।

মুখপাদে চরিত্রগুলি এক একটা গান করে এসে তাদের পরিচয় দেয়। এটিব আছে দুটি অংশ। প্রথমটিকে বলে 'ধূয়া' ও দ্বিতীয়টিকে বলে 'চিতানি'। ধূয়ায়

আড়াই ফের গান। 'চিতানি' অংশে আছে দুই-ফের গান। তেহাই—অর্থাৎ মান পর্যন্ত সব গান-ই হয়, অর্থাৎ ২/২½/৩ সব ফেরাই হয়। তবলারও বিভিন্ন বোল বর্তমান।

গম্ভীরা গানের অনুসঙ্গ হিসেবে আদিযুগে ছিল ঢোলক। মুখপাদের তিনজন ব্যক্তি শুদ্ধ একতালে গায়। চতুর্থজন পরে দাদরায় গায়। ধিন্, ধিন্ গাগ, ধা তিন্ নাগ্, তার সঙ্গে রেলা ও তারপর তেহাই।

'মুখপাদের' পর বন্দনা, সেখানে খেমটা সুর বর্তমান।

বোল— ধেটে ধেনে তেনে
তেটে ধেনে তেনে

রেলা— ধাগে তেনে ঘেনে
নাকো তেনে কেনে
তাকো তেনে ঘেনে
নাগো ধেনে ঘেনে

৩ বার তেহাই—

ধা তেনে ঘেনে
নাগো ধেনে ঘেনে।

চারইয়ারী শুদ্ধ একতালা, খেমটা ও দাদরায়—

ধিন্ ধিন্ ধা, ধাগে তিন্ না
কত্ তিন্ ধাগে, তেটে ধিন্ তেটে

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে স্বর্গীয় ধনকৃষ্ণ অধিকারীর দল জংলা, একতালা ও দাদরায় বাজাতো—

ধা তেটে ধিন্, ধাগে তেটে তেটে
তা তেটে ধিন্ তা ধিন্ তা ধিন্ ধা +

গম্ভীরা গানে শিবকে উপস্থিত করে অর্থাৎ শিব সাজিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে গানের প্রচলন কিন্তু খুব বেশী দিনের নয়। ইংরেজবাজারের বিখ্যাত বর্ষীয়ান্ গম্ভীরা গায়ক বিশ্বনাথ পণ্ডিতের মতে প্রায় ছ'। সাত দশক আগেই এর প্রচলন। প্রচলনেব কারণও খুব চিত্তাকর্ষক।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বাংলার গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একবার মালদহে আসবার কথা ছিল। স্থানীয় বিখ্যাত গম্ভীরা লেখক ও গায়ক মোহাম্মদ সুফী আশুতোষ অর্থাৎ শিবের [শিব বা মহাদেবের

অপর নাম] সম্মুখে গম্ভীরা গাইবেন ঠিক করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি একজন পাত্রকে শিব সাজিয়ে আসরে হাজির করেন। কিন্তু অনিবার্যকারণ বশতঃ স্যার আশুতোষ মালদহে না আসায় তাঁর এক প্রতিনিধি আসেন। মোহাম্মদ সুফী তবুও শিবকে উপস্থিত করে যে গান গেয়েছিলেন তার কিয়দংশ স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি করেছেন শ্রীপণ্ডিত—

হে ত্যাখ্, হো ত্যাখ্ কারে ডাকতে
কেডা এল ভাইরে—
ইনি কি স্যার আশুতোষ ? হাইকোর্টের জজ
গায়ে মাথা কেন ছাইরে ?[১]

এ চিত্র চিত্তাকর্ষক হওয়ায় পরবর্তীকালে সব গম্ভীরায় শিব উপস্থিত হতে থাকেন, তখন তিনি স্যার আশুতোষ নন, তিনি সর্বকর্মের হোতা—পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সরকারের প্রতিনিধি। সুতরাং শিবের চরিত্রকে গম্ভীরা গানে উপস্থিত করা ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলার মূলে সুফী মাষ্টারের অবদান অনস্বীকার্য। শিব এখন সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের (feudal) প্রতিভূ। সুতরাং রূপকার্থে শিবের এই ব্যবহার অন্য কোন লোকনাট্যের মধ্যে দেখা না যাওয়ায় গম্ভীরা কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

গম্ভীরা গানে প্রথমে ঢোলক ও জুড়ি কেবল মাত্র ছিল সম্বল। আনুমানিক বছর পঞ্চাশ আগে থেকে গোপাল দাস (দাস গোপাল নামে পরিচিত) হরিমোহন কুণ্ডু, শরৎ দাস ও মোহাম্মদ সুফীর আমলে হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলার প্রচলন হয়। বাঁশীর প্রবেশ হাল আমলের অর্থাৎ প্রায় বছর ত্রিশ আগে থেকে।

এবার গানের আসরের দিকে তাকানো যাক। গম্ভীরা ঘরের দিকে মুখ করে গায়কেরা পাত্র-পাত্রীরা থাকে। পাত্র-পাত্রীদের দক্ষিণদিকে থাকে যন্ত্র-সঙ্গীতশিল্পী ও দোহারকের দল। তাদের অবস্থানের চিত্রটি সাধারণতঃ যেভাবে থাকে তার একটা চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে।

গম্ভীরা ঘর না থাকলে অন্যত্র যেখানে গম্ভীরা গান হয়, সেখানে ঐ একই কাঠামোয় আসর বসে।

যন্ত্র-সঙ্গীত শিল্পী থাকে—

১. হারমোনিয়াম—১ জন
২. জুড়ি—২।৩ জন

৩. ডুগি-তবলা—১ জন

৪. দোহার—২ থেকে ৬।৭ জন পর্যন্ত

৫. বাঁশী—১ জন

এইবার গম্ভীরা গানের আসরের চিত্র তুলে ধরা যাক

সাংকেতিক চিহ্ন
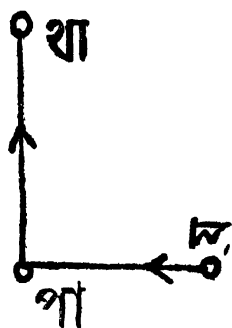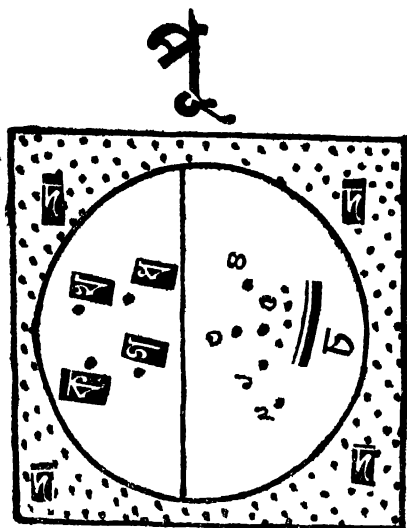
পূ—গম্ভীরা ঘর দ—দর্শক

গায়ক-শিল্পী (পাত্র-পাত্রী)—ক, খ, গ, ধ হারমোনিয়াম—১ বাঁশী—২

জুড়ি—৩, ৪ ডুগি—৫ দোহার—চ থা—থান পা—পাত্র-পাত্রী/শিল্পী

য—যন্ত্রসঙ্গীত-শিল্পীবৃন্দ।

বন্দনা অংশে থাকে ১ মহাদেব

২ চারজন পাত্র [একজন সাধারণ নাগরিক বা উচিৎ বক্তা]

বৃত্তাকারে থাকে দর্শকেবা। যেখানে গম্ভীরা মণ্ডপ নেই, সেখানে অন্যান্য চিত্র একই রকমের।

বন্দনা অংশে মহাদেব সেজে একজন আসে। পরিধানে বাঘছাল, ডান হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ও বাঁ হাতে ডম্বরু। তাকে উদ্দেশ্য করে অন্য

কয়েকটা চরিত্র বক্তব্য রাখে। মহাদেব এখানে রূপকার্থে উপস্থিত হন। প্রথম যুগে তিনি 'ফিউডাল লর্ড' আগেই বলেছি। এখন তিনি সরকার। তাঁকে দেশের নানা দুর্দশা সম্পর্কে অবহিত করা ও তার প্রতিকারের জন্য আবেদনই সংলাপের মুখ্য বিষয়বস্তু। এখানে উভয় পক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি চলে। অন্য চরিত্রগুলির গায়ে ছেড়া গেঞ্জি পরনে ধুতি (মালকোঁচা করে)। কপালে চূণের টিপ, মাথায় ও হাতের কব্জিতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বা দড়ি বাঁধা থাকে—এর অর্থ দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ। রূপকের অর্থ—সরকারের দরবারে সাধারণ মানুষের ফরিয়াদ। কিছুক্ষণ সংলাপ চলার পর শিব প্রতিকারের আশ্বাস দিয়ে হন অন্তর্হিত।[২]

শিবকে উপলক্ষ্য করে গান শুরু হল।—

কি করলি হে দশা দৈন্য
দেশের লোক পায় না অন্ন
হায় কি রে পস্তানার কথা
শায়েস্তা খাঁর আমলে শিব হে।
তখন গরীব দুঃখী আছিল সুখী
টাকায় আটমনের ভাও চাউল হে
কুণ্ঠে (=কোথায়) গেল সে সুখের দিন
হনু দিনে দিনে দীনের অধীন শিব হে।
এখন আট সেরেরও ভাও জুটে না
দু বেলা প্যাটে ভাত জুটে না
তোর নন্দী ভিরিঙ্গী বুড়হ্যা দামড়া
কি দিয়ে পুজবো, কহেক হামরা শিব হে
বছর বছর আছিস কেন
দ্যাশচ্ লক্ষ্মীছাড়া শস্যশূন্য .....

যদিও শিব-বন্দনাই গম্ভীরার মুখ্য বন্দনা, তবুও অন্ততঃ একজন গম্ভীরা কবির গানে কার্তিক-বন্দনা বর্তমান। বাংলা ১৩৪৪ সালে গোপাল দাস বন্দনা গান গাইলেন—

লম্বা কোঁচা জুতা ফোতা [=চাদর]
ছাই মাখা যার বাপরে।
নবাবীতে বাদশাদীতে
গণশার কাটা কাপরে [=গরীবের বিলাসিতা বা ঢঙ]

যার ঘর গৃহস্থী সব ফাঁকা
সেজেছে দেখ্ কাঙাল বাঁকা
যার মা তারা, পাঁঠা প্যারা [=মহিষ শাবক]
খেয়ে করলো সাফ্ রে
লম্বা কোঁচা……

শিব-বন্দনার পর নানা বিষয়বস্তু নিয়ে গান হয় তৈরী। এক একটা অনুষ্ঠানে অন্ততঃ চার থেকে পাঁচ। ছয়টি বিষয়বস্তু থাকে। সময় লাগে আড়াই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা। বিভিন্ন সমস্যা থাকে ঐ সব বিষয়বস্তুতে, যেমন ভাষা সমস্যা, ইংরেজী শিক্ষার কুফল, দেশের রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদি। হাল আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক, দেশীয় ও আন্তর্দেশীয় রাজনীতির কথাও ধরা পড়ে এই সব বিষয়বস্তুতে।

বন্দনাব পরবর্তী সব অনুষ্ঠানসূচীতে অভিনেতাদের মধ্যে একজন একেবারে ছিন্নবস্ত্রে থাকে। সে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি। তার বক্তব্য সবচেয়ে কৌতুকপূর্ণ কিন্তু নিষ্ঠুর সত্যের মোড়কে ঢাকা। হাস্যরসের মাধ্যমে বক্তব্য পরিস্ফুট করে কুশী-লবেরা, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে কঠিন সত্য। কথাগুলি লোকদের ভাবায়।

গম্ভীরা গানে শিববন্দনা ও অন্যান্য গানগুলি লেখ্য, কিন্তু অন্যান্য সংলাপ যা মূলগানকে ব্যাখ্যা করে তা পাত্রেরা তৎক্ষণাৎ (Extempore) তৈরী করে অনুষ্ঠানে। এখানেই তাদের কৃতিত্ব।

এক একটা বিষয়বস্তু হয়ে গেলে শিল্পীদের বেশভূষার পরিবর্তন ও মঞ্চ পরিবর্তনের (হয়ত বা একখানা চেয়ার বা টেবিল) প্রয়োজন ঘটলে এ সময়ের জন্য [৫ থেকে ১০ মিনিট] একটা শিশু বা বালিকা শিল্পী প্রদীপ, আগুন ইত্যাদির খেলা দেখায়। নেচে নেচে (খেমটা) গানও করে। সে গানের ঢঙের সঙ্গে মূল গম্ভীরা গানের সুরের কোন সম্পর্ক নেই। সেই সময় যন্ত্র-শিল্পীরা বাজাতে থাকে বাদ্য যন্ত্র। ইদানীংকালে এগুলো উঠে যাচ্ছে। দর্শক-শ্রোতাদের বিশ্রামের জন্যও এই বিরতির (Relief) প্রয়োজন। এটি গম্ভীরা গায়ক মোহাম্মদ মেরাজউদ্দিন, ধরনীর সাহা ও শিল্পী হরিবোলা থেকে প্রচলিত।

গম্ভীরা গানে মহিলা শিল্পীর প্রবেশ ঘটেনি এখনও, যদিও এখনকার শহরের যাত্রায় ঢুকে পড়েছে। পুরুষশিল্পীরা মহিলা চরিত্রের বেশ ধারণ করে। এদিক

থেকে গম্ভীরা এখনও সাবেকী ঢঙে চলে আসছে। 'ডুয়েট' বা দ্বৈত বিষয়বস্তুতে একজন পুরুষ ও একজন নারী চরিত্র থাকেই।

গম্ভীরা গানে 'চার-ইয়ারী বর্তমান। চার ইয়ার বা বন্ধু, অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে এখানকার পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চার। বৈঠকী ঢঙে চলে সংলাপ ও গান। এখানকার বোল একতালা। সুফী মাষ্টারের আমলে ধনকৃষ্ণ অধিকারী এ বোলে বাজাতেন।

গম্ভীরার ডুয়েট (Duet) ও চার-ইয়ারী অংশে নাট্যের ভাগ গানের চেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য এটি লোকনাট্য। এর নাট্টিক চবিত্র আলোচনার ব্যাপারে নাটক সম্পর্কে সামান্য সংক্ষিপ্ত অলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।[৩]

নাটকের প্রধান অঙ্গ চারটি কাহিনী—চরিত্র, ঘটনা, সমাবেশ ও সংলাপ। লোকনাট্যেরও তাই। কেবল দৃশ্যপধ সেখানে নেই। এই বৈশিষ্ট্য মূল যাত্রার (ইদানীং কালের অপেরাধর্মী যাত্রার নয়), কেবল দৃশ্যপট এখানে নেই। যাত্রাব সঙ্গে পার্থক্য এখানেই। তাছাড়া নাটকের মধ্যে যে গতি (Tempo) বা action যাত্রায় বর্তমান—তার বাহুল্য বীর ও রৌদ্ররসের বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে থাকে আবেগপূর্ণ সুদীর্ঘ সংলাপ বা বক্তৃতা, আর থাকে স্থুল হাস্যরস পরিবেশনের জন্য ভাড়ামির চেষ্টা।

যাত্রার সঙ্গে গম্ভীরার দৃশ্যপটেব অভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু অমিল হল তার সুদীর্গ বক্তৃতা ও রৌদ্ররস পরিবেষণের চেষ্টা। ভাঁড়ামো (Baffoonary) এখানেও লক্ষণীয় নয়, এখানকার রসিকতা সার্কাস বা যাত্রার ভাঁড়ামো নয়। অঙ্গ-ভঙ্গী (Gesticulation) ও বক্তব্যের (সংলাপ) মাধ্যমে বঙ্গরসিকতা এত তীব্র যে সত্য কথাটি রসিকতাব শর্করাব মোড়কে পরিবেশিত হয়। পরে চাবুকের মত তা গায়ে লাগে।

ভূমিতে গম্ভীরার পাত্র-পাত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়অনুগ সেই পবি-বেশকে ফুটিয়ে তোলে।

গম্ভীরা গানের মধ্যে বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী থাকে। সাধারণতঃ দুই বা চার জন। দু'জনে হলে হয় ডুয়েট (Duet), চার জন হ'লে হয় চারইয়ারী। পালাবন্দী গম্ভীরাব গান ছাড়া অন্য কোথাও পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা চারেব অধিক হয় না। এর মধ্যে একজন সাধারণ জনগণের প্রতিনিধি বা স্পষ্টবক্তা বা উচিত বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। এ ভূমিকাটি গ্রহণ করে দলের সর্বাপেক্ষা দক্ষ অভিনেতা। তার বক্তব্য ও রঙ্গ-পরিহাসেই গম্ভীরার নাট্টিক ভাবটি পূর্ণরূপে

পরিস্ফুট হয়। কাহিনীর মধ্যে গতি বা Tempo বর্তমান। দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি ঐ সাধারণ বক্তারই দিকে। সম্পূর্ণ বক্তব্যটি পরিস্ফুটনে তার ভূমিকাই মুখ্য। তার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপরে নির্ভর করে অনুষ্ঠানের মান।

গম্ভীরা গান আদিযুগে কেবলমাত্র গানই ছিল, সুতরাং লোকসঙ্গীত হিসেবেই কেবলমাত্র গম্ভীরার মূল্যমান হতো নিরূপিত। কিন্তু ইদানীং কালে পাত্র-পাত্রীদের সংলাপও চলে, তারই মধ্যে গান। কখনও বিশিষ্ট কোন এক পাত্রের মুখ নিঃসৃত, কখনও বা সমবেত কণ্ঠে, কখনও বা ধুয়ার (Refrain) ন্যায়, সুতরাং লোকনাট্যের গুণসম্পন্ন এই গম্ভীরা গান।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গম্ভীরা গানে এমন বহু শব্দ ব্যবহৃত যা কেবলমাত্র মালদহ অঞ্চলেরই ভাষা অর্থাৎ তা জেলার বিশিষ্ট ভাষা, সুতরাং মালদহের চৌহদ্দীর বাইরের মানুষের পক্ষে সেই শব্দগুলির রসাবেদন পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই বাধা থাকলেও অন্য এলাকাতেও বিষয়বস্তু ও তার সামগ্রিক রসসৃষ্টির মূল্যে তার আবেদনও কম নয় সন্দেহ নেই। নাটকীয়তায়, বঙ্গে ও ব্যঙ্গে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হৃদয়ের গভীরে যেয়ে পৌঁছে। গম্ভীরা কবি-শিল্পীরা নিজেরাই কেবলমাত্র ভাবেন না, সাধারণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ-নীচ, গ্রাম্য-শহুরে, ধনী-নির্ধন সকলকেই ভাবান।

সাধারণতঃ গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই হয় তৈরী। এখানে সকল দল ও মতের ত্রুটিগুলি হয় সমালোচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু অনুপ্রবিষ্ট হয়। লোকশিক্ষা দান ও সমাজসচেতনতার উদ্বোধন এই গানের উদ্দেশ্য, তবুও পৃথক ভাবে দু'জন মুসলিম গম্ভীরা গান রচয়িতার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। তাঁরা হলেন—মোহাম্মদ সুফী রহমান (সুফী মাষ্টার) ও সেখ সোলেমান (সোলেমান ডাক্তার)। ধর্মের বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রে গম্ভীরা গানের উপস্থিতি তাঁদেরই পদচিহ্ন লক্ষ্য করে।

আদিতে সমাজের বা গ্রামের কোন ব্যক্তিবিশেষের (প্রভাবশালী ব্যক্তিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য) ত্রুটি-বিচ্যুতি চিত্রিত হতো। কারণ সাধারণ গ্রামবাসী সে সমস্ত ঘটনা থেকে মজা পেতো। দূরবর্তী কোন ঘটনা বা বৃহত্তর সমাজ অথবা রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি কখনই তেমন মনকে আকর্ষণ করতে পারে না, তাই এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা অধিকতর আকর্ষণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তুও গানে জায়গা করে নেয়। এ ধারার প্রবর্তক

উক্ত মুসলিম রচয়িতাগণ। কারণ হিন্দুর ধর্মীয় চৌহদ্দীর বাইরে তাঁদের যেতে অসুবিধে হয় নি। ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টির অধিকারী তাঁরা ছিলেন বলে এটি প্রবর্তনে তাঁদের সুবিধে হয়েছিল। এর ধারাই আজ বেগবতী হয়ে গম্ভীরা-গান সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে বিলম্ব করে নি।

গম্ভীরা গান শেষ হয় একটা সর্বজনগ্রাহ্য সমাধানের মধ্য দিয়ে। সংলাপগুলি পৃথক লেখা হয় না। তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কতকটা কবিগানের মত। উপস্থিত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তৈরী করে পাত্র-পাত্রীরা। দলপতি বা অধিকারীর পরামর্শমত বা নির্দেশমত, কখনও বা নিজেরা আগেভাগে আলোচনা করে নিয়ে গানের আসরেই নিজস্ব উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী সংলাপ তৈরী ও রঙ্গরস পরিবেশন করে পাত্রেরা। এতে শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশও ঘটে সন্দেহ নেই। বিশেষ ব্যঙ্গ-কৌতুকে যিনি সুনাম অর্জন করেন, তাঁর নামেই প্রধানতঃ দলের নাম প্রচারিত হয়, যেমন ইংরেজবাজারের মটব বা চলিত কথায় 'মটবার গান' বা 'নিরুর গান', অথচ গান রচয়িতা হয়ত দেবনাথ রায় ওবফে হাবলা বা গোপীনাথ শেঠ। যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বা মটরবাবুর ম্যানারিজন্ (mannarism) ও সংলাপের ঢঙ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সাগ্রহে গ্রহণ করে বলে তাঁর অনুষ্ঠান ব্যাপক আকর্ষণের ব্যাপার।

গম্ভীরা গানের আবেদন শেষ পর্যন্ত দর্শক-শ্রোতাদের নিকট কেমন ভাবে যেয়ে পৌছে, তা নিম্নলিখিত ছকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পাবে—
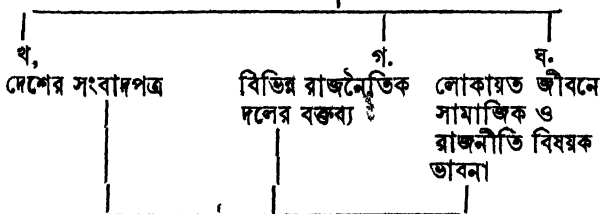
রসিকতাযুক্ত উদাহরণ সমন্বয়ে সংলাপ যা তাৎক্ষণিক সৃষ্ট (ক্ষীণ কাঠামো আগে-ভাগে অবশ্য সৃষ্ট হয়)

= মূল গান + সংলাপ + স্থানীয় বিশিষ্ট শব্দ-সম্ভার + স্থানীয় লোকায়ত উদাহরণ + রস-রসিকতা

উপরোক্ত ছকটি গাণিতিক সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় এমনভাবে যদি

১. অংশকে $\frac{dA}{dx}$ ও খ, গ, ঘ কে B, C, D ধরি

তবে $f'(x)$

$$\frac{dA}{dx} = \frac{d}{dx}(B+C+D)$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(B) + \frac{d}{dx}(C) + \frac{d}{dx}(D)$$

আবার দেখা যায়, $A \propto B+C+D$

২. সংবাদ বা রিপোর্ট (খ)
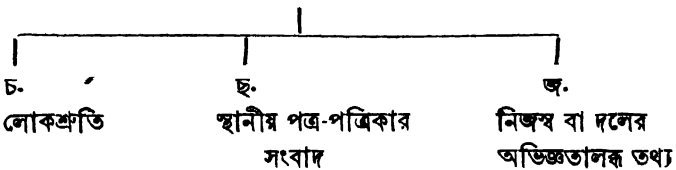
অতএব,

গম্ভীরা গান (গৌণ)—সংলাপ, ব্যাখ্যা, উদাহরণ + রস-রসিকতা (মুখ্য)

এবার একটি মডেলের মাধ্যমে গম্ভীরা গানের সৃষ্টিকে তুলে ধরা যেতে পারে—
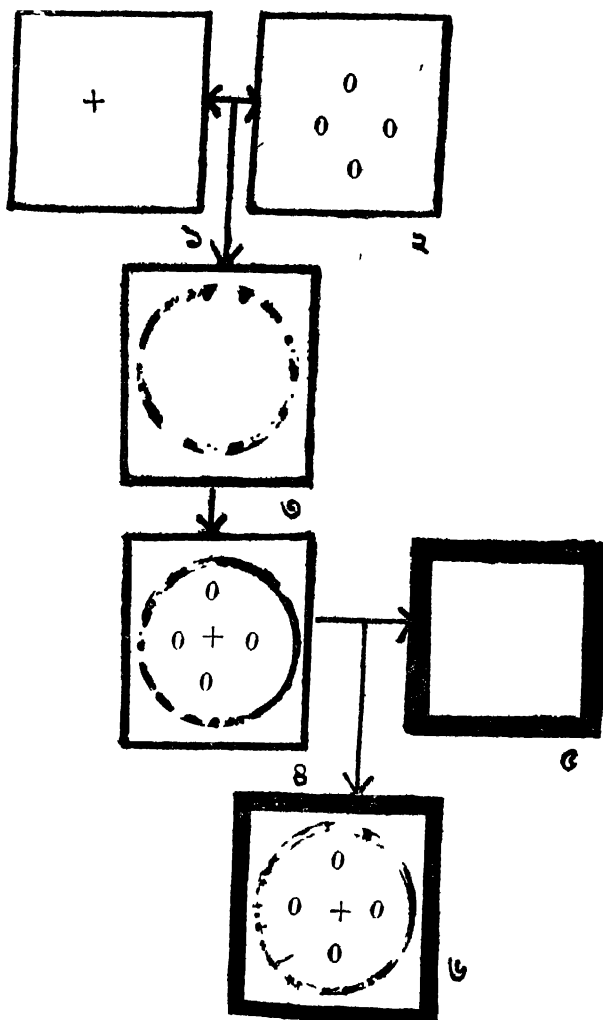
১. বাইরের জগতের তথ্য ২. লোকজীবনের ভাব-ভাবনা

৩. লেখকের নিজস্ব চিন্তার জগৎ ৪. ১, ২, ৩ এর যোগফল

৫. পাত্র ও পাত্রী (ছদ্মবেশ)র সংলাপ-অভিনয়

৬. ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর যোগফলে সম্পূর্ণ লোকনাট্য।

গম্ভীরা গান আজ দ্রুত অবক্ষয়ের পথে। সারা মালদহ জেলায় মাত্র দুটি দলই এখন প্রথম শ্রেণীর। অন্য যেগুলি আছে তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া ভার।

আজও খ্যাতনামা গম্ভীরা দলগুলি বিশেষ কোন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গান রচনার প্ররোচনায় রাজী হয় না। ফলতঃ সমালোচনা যে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তীব্র হয়, তারা প্রথমে অর্থ দ্বারা প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে। কোন কোন স্থানে ইদানীংকালে দৈহিক নির্যাতনের খবরও মিলেছে। কিন্তু মটরবাবু বা নিরুবাবুর দল সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে গেয়ে চলেছে এবং তাতে অধিকতর লোকপ্রিয় হচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যক্তিগত কেচ্ছা (individual misdeeds) বা স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি-বিচ্যুতি গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত, আজ সেগুলি বেশ কিছুটা স্তিমিত। বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাপক সামাজিক বা রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করে শিল্পীরা দেখে কৌতুকের দৃষ্টিতে সমগ্র ব্যাপারটি, অনেকটা কমলাকান্তের মত।

গম্ভীরা গানের পালাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে গাওয়া চলে। যেমন বন্দনা, পালা, টপ্‌পা, চারইয়ারী, খবর বা রিপোর্ট, সালতামামী, ধুয়া, মজামারা বা রঙ্গ-রসিকতা, আল্‌কাপ বা খেমটা।

শেষ অংশ গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠানের—খবর বা রিপোর্ট (Report) অর্থাৎ একটা বিশেষ অঞ্চল বা শহরের (যে স্থানে এই অনুষ্ঠান হয়) নতুন খবরাখবর। ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই এখানে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় যেটি মাত্র দুটি চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি মানুষকে অবহিত করার একটি বিশেষ মূল্যবান মাধ্যম এটা। পূর্ববর্তী বৎসরের পর্যালোচনা এর মধ্যে ধরা দেয়।

গম্ভীরা গান প্রকৃতপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বৎসরান্তে লোকসমাজ কর্তৃক বর্ষবিবরণী পর্যালোচনা। এটি ইন্দো-মঙ্গোলয়েড জাতির একটি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। আরব, মিশমি, প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এইভাবে পূর্ববর্তী বৎসরের বিবরণী পর্যালোচনাকে মনে করিয়ে দেয়।

বিভিন্ন সুরে গাওয়া হয় গম্ভীরা গান। মিলে মিশে গেছে বিভিন্ন সুর। কিন্তু তবুও একটা বিশিষ্ট সুর তৈরী সে করে নিয়েছে। ঝাঁপতাল, একতাল, খেমটা, ত্রিতাল, কাহারবা, দাদরা, জংলা (বোলহীন মিশ্র সুর) এখানে বর্তমান। ইদানীংকালে হাল আমলের হিন্দী ও আধুনিক বাংলা গানের সুরও

মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাতে দল নিন্দনীয় হচ্ছে, কারণ তা মূল গম্ভীরা গানের নির্দ্ধারিত সুরের ব্যতিক্রম মাত্র।

আলকাপ্, রামপ্রসাদী, বাউল, কীর্তনের সংমিশ্রণে গম্ভীরা সঙ্গীতের উদ্ভব,[২] তবে আলকাপের প্রতিষ্ঠিত সুবের প্রভাবই তার উপরে সর্বাধিক এই তথ্য মিলেছে আইহো নিবাসী স্বর্গীয় গম্ভীরা-কবি সতীশ গুপ্ত ও ইরেজবাজারের বর্ষীয়ান কবি-শিল্পী শ্রীবিশ্বনাথ পণ্ডিতের নিকট থেকে।

মাত্র পাচ-ছয় দশক আগে এই বিশিষ্ট সুরের জন্ম। তার আগে গম্ভীরায় কেবল শিবকে উদ্দেশ্য করে গান গাওয়া হত। তাতে সুরের কোন বৈচিত্র্য ছিল না। উনিশ শতকের একেবারে শেষ ও বিশ দশকের প্রথম দশকে এক একটি গম্ভীরা পূজার থানে বহু দল মিলিত হত। গান হয়ত সমস্ত রাত ও পবের দিনের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত চলত। যে দলেব যে সুরটি উপভোগ্য হত, সেটি অন্যদল গ্রহণ কবে গান গেত পরবর্তী সময়ে। এখানে স্মরণীয় যে আগে সুর পরে শব্দ বা কবিতার অংশ। ইংবেজবাজার থানার অমৃতি গ্রামেব লোহারাম খলিফার এ সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বর্তমান। লোহারামেব সুরজ্ঞান ছিল অসাধারণ, তাবই সঙ্গে ছিল সুরেলা গলা। তিনি মুখ্যতঃ ছিলেন আলকাপ গায়ক। এক সময ছিল যখন লোহারামের সুর হয়েছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তাঁব গানের সুরই যে পরিপূর্ণ ভাবে গম্ভীরায় এসেছে, তা নয়, অনেকেরই এসেছে, তবে লোহারামেব অবদান বেশী একথা মানতেই হবে।

এ ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয়। লোহারামের গান বা হয়ত অখ্যাত এক দলের এক টপ্পা জাতীয় গানের সুর সুন্দর হল। গ্রহণ করলো সেই সুর আরও অনেক অনেক দল। এমন ভাবেই বিশ শতকের প্রথম দু তিন দশকের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠিত সুর জন্ম নিল। আসলে আলকাপের সুরের উপরে ভিত্তি করেই মূলসুর জন্ম নিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় তো বটেই, মালদহ জেলার বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে অর্থাৎ কালিয়াচক, সুজাপুর, মানিকচক ও ইংরেজবাজার থানায় বেশ কয়েকটি বিখ্যাত আল্কাপ দল আছে। আল্কাপের জন্মও বর্ত্তমান গম্ভীরার সুরের পূর্বে তাই আলকাপের সুর গম্ভীরা গ্রহণ করেছে। গম্ভীরার সুর আলকাপে যায় নি। সাক্ষী অশীতি-পর বিখ্যাত গম্ভীরা কবি স্বর্গীয় সতীশ গুপ্ত ও গম্ভীরার ইতিহাসবেত্তা বর্ষীয়ান কবি সুকণ্ঠ বিশ্বনাথ পণ্ডিত।

গম্ভীরা গান সাধারণতঃ কীর্তন, জারি প্রভৃতি গোষ্ঠীসঙ্গীতের অন্তর্গত।

এ গানে লাভ—লোকশিক্ষা। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণ অনেক শিক্ষালাভ করে এর মাধ্যমে। যত সহজে এ গান ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে, সে রকম কোন মাধ্যম তাছে কিনা আমাদের জানা নেই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাই সুর-সাধক দিলীপকুমার রায়কে মালদহে গিয়ে গম্ভীরা গান-নাচ দেখতে চিঠি দিয়েছিলেন।

এ গানের গায়ক সম্পর্কে বলা চলে যে তথাকথিত অভিজাত গায়কেরা উদাসীন বলে প্রতিভাবান গায়ক এখানে মুষ্টিমেয়। ভাল কুশী-লব ও বিরল। সমগ্র মালদহ জেলায় এখন মাত্র দুজন সেই বিরল প্রতিভাবান অভিনেতা—তাঁরা হলেন মটর ও তাঁরই হাতে গড়া শিষ্য নিরু। আইহোর কবি প্রয়াত ইন্দ্রদমন শেঠ দুঃখ করে বলেছিলেন বছর দশেক আগে—'গায়কের অভাবে গান গাওয়ান হয় না। খাতার গান খাতায় লেখা থাকে। নতুন নতুন গায়কের জন্ম না হলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত গম্ভীরা গান গাওয়ানোই হবে না।'

বৈষ্ণব পদাবলী যেমন পাঠে নয়, গানে পাওয়া যায় অনাবিল আনন্দ, তেমনি গম্ভীরা গান তখনি হয়ে ওঠে নিটোল যখন গীত-বাদ্য-সংলাপে তা প্রকাশ পায়। শুধু মাত্র পাঠে তার ভগ্নাংশও আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়।

গম্ভীরা গানে অশ্লীলতা এসে পড়েছে বলে যে অভিযোগ অনেকে করেন,—তা অসত্য। নগরকেন্দ্রিক গুম্ফস্ফুরিত হাস্যকে এখানে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু মেঠো হাসি উপস্থিত সকল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে লেগে থাকে। দু চারটি শব্দ বা সম্বোধন গ্রাম্য হতে পারে, কিন্তু তা কখনই অশ্লীল নয়।[8]

এ গানের পরিবেশেরও একটা মূল্য বর্তমান। গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ ধুলোপায়ে সাধারণ সুখ-দুঃখ, সমাজনীতি, লোকাচার, দেশাচারের কাহিনী এর মধ্যে পেয়ে থাকে, যা হয়ত নন্দনতত্ত্বের তৌলে নগরের তথাকথিত সভ্য মানুষের (Sophisticated) নিকট বিশেষ মূল্যবান নয়। মালদহ জেলার চৌহদ্দীর বাইরে যে গম্ভীরা গানের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার আবেদন রসজ্ঞ মানুষ গ্রহণ করলেও পরিপূর্ণ রসগ্রহণের জন্য তার লোকায়ত শব্দ ও রস-রসিকতার জন্মভূমিতে যাওয়া প্রয়োজন।

গম্ভীরা গান ও বাংলার জনশিক্ষা-

অজ্ঞ নিবক্ষর জনগণের কাছে দেশেব নানা খবর পৌছে না। যদিও বিংশ শতকের শেষপাদে সংবাদপত্র নিভৃত গ্রামেও জায়গা করে নিয়েছে, তবুও বিরাট একটি স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণেব কাছে তারা আজও গিয়ে পৌছোয় নি। কিন্তু তাদেব নিকটে লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, কথকতা, লোকনাট্য, যাত্রা ও লোকশিল্প যে ভূমিকা গ্রহণ কবে তা শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মবণীয। তাদের স্বীকাব না করলে জাতীর ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে। ধর্ম, সমাজ এবং পরবর্তী সময়ে বাজনীতি সম্পর্কে নিবক্ষব জনগণের মধ্যে এমনভাবে এরা শিক্ষাবিস্তার করে, তাতে তাদেব আসন নিঃসন্দেহে সমাজ শিক্ষকেব। ধর্মকে অবলম্বন করে 'গম্ভীরা' সৃষ্টি হযেছিল সত্য। কিন্তু ধর্মকে উত্তরণ করে সমাজেব ক্রটি-বিচ্যুতি, দেশের ক্ষয়-ক্ষতি ও তাব সমাধানের নির্দেশ এ সঙ্গীত ও নাট্যের কাছ থেকে মিলতো। মিলতো সমাজজীবনের সত্য-অসত্য সম্পর্কে শিক্ষা ও কর্তব্যবুদ্ধির উপদেশ। এ কবিরা গভীর জ্ঞানের অধিকাবী নন বটে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোন নীতি বা তত্ত্বের উদ্গাতাও তাঁরা নন, কিন্তু জীবনের নানা ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে সমাধানের পথনির্দেশ করায় প্রকৃত জনশিক্ষকের মর্যাদায় তাঁবা অভিষিক্ত। বাংলার জনশিক্ষায় গাজনের সন্ন্যাসীবা কোথাও কোথাও তাদের দায়িত্ব পালন করে জন-সাধাবণকে শিক্ষা দিযে, যা কৌতুক ও ব্যঙ্গবিদ্রূপেব মোড়কে পরিবেশিত, গভীর সত্য ঢাকা থাকে কৌতুকের আবরণে। প্রসঙ্গতঃ বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সুপবিচিত সঙের গান, পটুয়ার গানেরও এই ভূমিকা লক্ষণীয়। তবে জনশিক্ষক হিসেবে গম্ভীবার ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণিত হয় কারণ প্রতিটি বিষয় ও গান সমাজ ও রাজনীতির জীবন থেকে আহৃত।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ বিশেষ রূপে স্রষ্টাচিত্তকে প্রভাবান্বিত করে। শক্তির ও অনুভবের তারতম্যে তার প্রকাশেরও হয় রকম ফেব। কোন কোন স্রষ্টার সৃষ্টিতে একটা পরিপূর্ণ যুগও প্রতিবিম্বিত হয়। অবশ্য তা ধ্রুপদী সাহিত্যের শিল্পী না হলে হয় না, কাবণ

সে সৃষ্টি দেশ ও কালের আধারে থেকেও দেশ ও কালোত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বজনীনতার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়।

বাংলা সাহিত্যের উষালগ্নের নিদর্শন চর্যাগীতি থেকে সুরু করে প্রকৃত পৈঙ্গল ইত্যাদিতে সমাজচিত্র মেলে। কিন্তু এঁর কবিরা সেই অর্থে লোককবি নন।

বাংলার লোকসংস্কৃতির জগতে দেখা গেছে যে সমাজের বা রাজনীতির ক্ষেত্রে যখনই উত্থান-পতন ঘটেছে, তার যন্ত্রণা-দুর্দশা সবই স্পর্শকাতর পল্লী-কবিদের মনকে নাড়া দিয়েছে সন্দেহ নেই। সেই চেতনা বৃটিশযুগে বেড়েছে সন্দেহ নেই, তাই তারই ধারাপথে দেখি—সতীদাহ প্রথা রোধ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। পণপ্রথার বিরুদ্ধে এমন কি খাদ্য আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনায় তাঁরা নীরব দর্শক হয়ে থাকেন নি। তাঁরা শোষণের বিরুদ্ধে, অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বার বার বিক্ষোভের কথা সোচ্চারে জানিয়েছেন।

গম্ভীরা গানের শিল্পী গণশিল্পী, তার কবি—গণকবি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোথাও এঁদের নাম লেখা হয়নি, কিন্তু এঁদের ভূমিকা তুচ্ছ নয়। সরকারের বিরুদ্ধে, দেশের শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের গান ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখেন নি। ১৯৪৪-৪৫ সালে মালদহের তাৎকালিক ইংরেজ-ম্যাজিষ্ট্রেট এইচ, এ, বার্নওয়েল কবি গোবিন্দলাল শেঠের সম্প্রদায়ের গান বাজেয়াপ্ত করেন এবং গোবিন্দলাল শেঠ, গোপীনাথ শেঠ, মটরবাবুকে গ্রেপ্তারও করেন। শেখ সোলেমানও তাঁর এজলাসে কৈফিয়ৎ দিয়ে আসতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে পাঞ্জাবী জেলাশাসক সি. এস. কাল্‌হন সে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন।

শুধু প্রাক-স্বাধীনতা যুগে নয়, স্বাধীনোত্তর যুগেও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে গান করায় মটর ও গোপীনাথের দল আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তবুও এই সব দলের নিজস্ব লোকচরিত্র আজও বর্তমান। দেশের শাসক সম্প্রদায়ের ভজনা করার জন্য দু'চারটি দল সব সময় তৈরী হয় বটে কিন্তু তারা বিক্রীত ও বিকৃত বলে কখনই লোকশিল্পী নয়।

বাংলার বয়াতী, কিষাণী, টুসু, রংপাচালী, বোলান, ভাটগীত, হাবু ও গম্ভীরায় প্রকাশ পেয়েছে সমাজ চেতনার কথা।

একটা কথা স্মরণীয় যে আজকের বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু যুক্ত গম্ভীরা গানের বয়স কিন্তু বেশী নয়। যদিও গম্ভীরা পূজা-উৎসব ও গানের জন্ম প্রায় দেড় হাজার বছর আগে।[১] সেদিক থেকে বাংলার অন্য লোক-

সঙ্গীতের চেয়ে সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়বস্তুতে সমৃদ্ধ গম্ভীরা বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্তু তার নিজস্ব প্রাণশক্তিতে রঙ্গে-ব্যঙ্গে-নাট্যে সে এই জগতে একক ও অদ্বিতীয়। সমাজ ও রাজনীতি-মনস্ক নেতৃবর্গের তাই সাগ্রহদৃষ্টি এই গম্ভীরার প্রতি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ থেকে।

বাংলার যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় লিখিত সাহিত্যে এই ধারার সূত্রপাত আধুনিক বাংলার। ধ্রুপদী ও লোকসাহিত্যের পটভূমিকায় গম্ভীরাকে স্থাপন করলে লোকচৈতন্যের উদ্বোধক হিসেবে তার স্মরণীয় ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিতব্য।

গম্ভীরা গানের রচয়িতারা যেমন ভাবুক রোম্যান্টিক কবি নন। তেমনি নন ধর্মীয় সঙ্গীত রচয়িতা বাউল, আউল, সুফী, মুর্শিদ্যা, মারফতী বা মরমিয়া কবি। মাটির পৃথিবীতে চোখ খুলে তাঁরা পথ চলেন। তাই তাঁদের বক্তব্যে বাস্তব চিত্র-কলা। এখানেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য। তাঁদের বক্তব্যে তাই সমস্যা জর্জর সমাজের শতছিন্নরূপের কথা, কখনও বা তার লজ্জাহীন শোষণের কথা। সমাজ চৈতন্যের মুক্তিদাতা হিসেবে তাই তাঁরা লোকসাহিত্যের জগতে সমাসীন।[২] ডঃ ভট্টাচার্য বলেছেন—'দারিদ্র্য পীড়িত সাধারণ মানুষ ধর্মের আশ্রয়ে দেবতার কৃপা লাভের মাধ্যমে দারিদ্র্য মুক্তির পথ খোঁজে, তাই গম্ভীরার প্রত্যেকটি গানই শিবঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত হইয়া থাকে। সংসারের সকল সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের কারণই শিব, তাহার নিকট এই সকল বিষয়ে অভিযোগ জানাইয়া প্রতিকারের প্রার্থনা করাই গম্ভীরা গানের মূল উদ্দেশ্য। শিব ঘটে অধিষ্ঠান করিয়া নির্বিকার ভাবে এই সকল অভিযোগ, এমন কি অনেক সময় তিরস্কারও শুনিয়া যান।'[৩]

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ গম্ভীরা কবি—

শিব হে! স্বরাজ পেলে মণ্ডা দেব
ঘন দুধের বাটী দেব
নইলে কাঁচকলা, ও ভোলা ও ভোলা।

কখনও বা গ্রামীণ শিল্পের প্রতি মর্মানুভূতিতে ভরপুর লোককবি—

গাঁওর শিল্প হয় মাটী
দ্যাশের মাটি আছে খাঁটি
নানা, কৃষিশিল্প মোকে শিখাও
দ্যাশকে বড় করি!

আবার কখন পণপ্রথার দুষ্টক্ষত দেখে পিতা ও কন্যার সংলাপের মাধ্যমে শিল্পী-আত্মা ঘৃণায় যন্ত্রণায় অস্থির।

পিতা / মা তোর বিহার লাগ্যা পড়্যাছি দায়ে
অমন শিক্ষাতে ধিক, অন্ধ অধিক বেচে যেন শালিক টিয়ে।

কন্যা / সোনার চেন, সোনার ঘড়ি গর্ব যাদের গলায় পরি
অমন পশু কিনো না বাবা দিয়ে টাকাকড়ি
বিহা কি পদার্থ, অপদার্থ বুঝে না ছেলে পেয়ে।

পিতা / ভণ্ড দেশের হিতৈষী, ওরাই রক্ত চোষে
বি-এ, এল-এ হলে ছেলে অর্থপিয়াসী
ধিক্ উচ্চ শিক্ষা, স্বদেশী দীক্ষা, প্রীতি কেবল টাকার মোহে।

কন্যা / বেচবে কেন ভিটেমাটি, বেচবে কেন ঘটিবাটি
মজবে কেন আমার তরে ভিটায় পুকুর কাটি
ভাল কুলীন কুল ই, কশাইগুলি, ফিরছে ছুরি শানাইয়ে।

পিতা / কোন জনে কল্লে কিবা পাপ, বাংলায় হতে হয় মেয়ের বাপ
বুঝতে নারি ত্রিপুরারি একি মনস্তাপ
যত ঘোষ আর বোস ধরেছে ইস্যু চাটুজ্জে, মুখুজ্জে পশুর হিয়ে।

কন্যা / কিসের ডিগ্রি, কিসের পাশ, ঐটি হলো গলার ফাঁস
কলেজ বসাইয়ে কল্লে কেবল দেশের সর্বনাশ
যারে কায়দাতে পার, মেয়েরি দায়ে
কর্ম সারে ধর্ম খেয়ে।

পিতা / কি কুক্ষণে আদিস্যুর, আনলে দেশে অসুর
বল্লালের চোখে নুন দিয়ে মারতে কেন কল্লে কসুর,
মেয়ের বাপ দুম্বা-মেষ, এ পোড়া বাংলা দেশ
নিত্যি খাচ্ছে মাংস কেটে নিয়ে দিচ্ছে ক্লেশ।

উপরোক্ত গানে পণপ্রথার সঙ্গে জঘন্য কৌলিন্য প্রথার মিলনে যে শোষণ সমাজ ব্যবস্থায় বর্তমান তার চিত্র পিতা-পুত্রীর সংলাপ কেমন সজল কারুণ্য রসে অভিষিক্ত হয়েছে!

অতীতে সর্বপ্রকার সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ও তার অনিবার্য ফলশ্রুতির জন্য দেবদেবীকেই দায়ী করা হত। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ঐকান্তিক কবিমন বলে ওঠে—

স্বরাজ যদি পাই ভোলা,
খ্যাতে দিব মাণিক (মর্তমান) কলা, নইলে
আঁঠ্যার (বিচি) কলা।

বানিয়া হল দেশপতি
কি বলব ভাই দেশের গতি
কাঁচ দিয়ে কাঞ্চনাদি নেয়
হাতে দিন্যা খোলা।

কি বলব হে ভোলা নানা
বুক ফুটেও মুখ ফোটে না
এ মুখ ফুটায় ভাতেব মত
উঠাও বণিকেব ঝোলা।

মনোরঞ্জন বলে কর যোড়ে
ক্ষমা কর শ্রোতা মোরে
উচিৎ কথায় চটে সবাই
বক্ষা করো ভোলা। (মনোরঞ্জন দাস)

অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারেব জন্য আবেদন—

ভোলা হে! ভোলা এ কি কব্যাছ মোদেব দশা.
ভাঙ ধুতুরা খায়্যা শুধু ব্যোম হয়্যা আছ বোস্যা।
প্যাটেতে আজ ভাত নাই, পরনেতে ত্যানা,
হাল-বলদ সব বেচ্যা ফেল্যা, দিতে হল খাজনা।
এখন করি কি হে, ভোলা নানা, তার উপরে রোগের জ্বালা
হারিয়্যা ফেল্যাছি দিশা।

কিন্তু ভক্তদেরই তো দুর্দশা শুধু নয়, শিব নিজেও দুর্দশাগ্রস্ত। তাঁর সাজ-সজ্জাতেও তো ভক্তি জাগে না। তিনি 'শিবায়ণ' বা 'শিবমঙ্গলের' চরিত্র।

শিব তোমার একি সাজ মাথায় বাঁইধ্যাছ কেলে জটা
ম্যালেরিয়ায় ভুগ্যা ভুগ্যা ভুঁড়ি কর্যাছ মোটা।
হাতি ঘোড়া ছাড়্যা দিয়্যা ষাঁড়ের উপর চড়্যা
তোমার কপাল গিয়্যাছে পুড়্যা।
এবার নতুন সাজে না' সাজলে পুজা করবে তোরে কেটা? ...

তবু এই বৃদ্ধকে না ছাড়ার ইচ্ছে, কারণ তার সমাধান তারই হাতে—

ধর ধর, দিস না ছাড়্যা লিয়্যা চলেক্ সঙ্গে কথ্যা।
এই বুঢ়াটা দিলে বড় দুক্ষু হে, দিলে বড় দুখ।
ধান বুনিলে ছ্যায় না পানি, এই বুঢ়াটা বড়ই শনি
সদাই রহে মোদের প্যাটে ভুক হে।
দামড়ার উপর চড়্যা বেড়ায় কুচনী পাড়ায় ঘুর‍্যা
বুঢ্যা ঠাট কুহুরা জানে কতই কর‍্যা বেড়ায় তুক হে
করে কতই তুক ।।

সিপাহী বিক্ষোভের পটভূমিকায়ও গম্ভীরা গীত রচিত হয়েছিল—

বুঝি ফিরিঙ্গী দল এবার ভাইরে ধোর‍্যা নিলে খাঁটা,
সিপাহী সব মিল্যা অদের করলে বলির পাঁঠা।
গরু আর শুয়ারের চর্বি দিয়্যা করলে যে রে টোটা।
হিন্দু আর মোসলেমের বুকে মার‍্যা দিল খঁটা
জাতিধর্ম নেই এক ফোঁটা।
(পরে) দুই ভায়েতে শল্লা কোর‍্যা, তাদের নাঢ়্যাৎ মারছে সাঁটা।
বারাকপুর আর রাণীগঞ্জে গ্যাল আগুন লাগ্যা।
ফিরিঙ্গী সব তল্পী ছাড়্যা, গ্যালো কুণ্ঠে ভাগ্যা।
সিপাহীর দল থাকলো সব রাইগ্যা
গোটা ভারত উঠল জাইগ্যা ।।

মালদহে সাঁওতাল বিদ্রোহের একটি ঘটনাও বর্তমান। মালদহ জেলার গাজোল থানায় ভারত বিখ্যাত আদিনা মসজিদের[৪] উপর অধিকার নিয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সাঁওতালদের সঙ্গে মুসলিমদের সংঘর্ষ বাঁধে। তৎকালীন বৃটিশ সরকার মুসলমানদের সমর্থন করে। ইংরেজবাজারের কোতয়ালীর জমিদার প্রয়াত হায়াৎ খান চৌধুরী সহ জেলাশাসক সাঁওতালদের আদিনা মসজিদের দখলের খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী সহ উপস্থিত হন। সাঁওতালদের নেতৃত্ব দেন হবিবপুরের খ্যাতনামা জিতু সাঁওতাল। সংঘর্ষের পরিণামে জীতুকে অকস্মাৎ গুলি করে হত্যা করলে সাঁওতালরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আদিনা মসজিদে সেই গুলির দাগ আজও বর্তমান। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করতে মোহাম্মদ সুফী একটি নাট্যধর্মী গান রচনা করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও জিতুর সংলাপে বিধৃত এই গানটি—

অনার্য জাতি এ সাঁওতাল

পচুই খেয়ে হই মাতাল

আদিনাটি করতে এলাম দখল হে—

গান্ধী মোদের বুঢ়াটি সেনাপতি ছোঁড়াটি

মন্ত্রী জীতু, এরা সবে প্রজা হে।

জীতু সর্দ্দার / এটা আদিনাথের ঘর, এটা আদিনাথের ঘর,

জনম জনম থাকব মোরা ইহারই ভিতর।

ম্যাজিষ্ট্রেট / এটা আদিনাথের ঘর বলিস যে

বলে কোন ইতিহাস বুঝে ?

জীতু / শিবম্ সত্যম্ মধুর রাজা

বাস করেছেন পাণ্ডব রাজা

উড়িয়ে দিয়ে ধর্মের ধ্বজা

বাজাব নিরন্তর। এটা আদিনাথের ঘর।···

মুসলমানদের বাংলা আক্রমণ ও পরমত অসহিষ্ণুতায় গৌড়বঙ্গের সমস্ত হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দির, বিহার ধ্বংস হয় এবং তারই অংশ বিশেষ মুসলিম মসজিদ ও সৌধের স্থাপত্যে লাগান হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। চিকা ভবন, আদিনা মসজিদ, একলাখি ভবনে তার সাক্ষ্য মেলে। বাংলা ১২৩৭ সালে বিপিন খলিফার গানে তার উল্লেখ আছে। যদিও কিছুটা একপেশে বক্তব্য লক্ষ্য করা যায় এখানে—

মুসলমানের কোন কীর্তি নাই কো গৌড়বঙ্গে।

নারীহরণ প্রজাপীড়ন, ছিল এ নব বঙ্গে হে।

হিন্দুদের যত কীর্তি করল তারা অপকীর্তি

নাম বদল্যা সব নিজের নামে নিলে বাহাদুরী

দেবদেবী আর গণেশ মূর্তিতে চালিয়্যাছে হাতুড়ী।

ভাঙ্গ্যা ভাঙ্গ্যা টুকরো কোর‍্যা নিজের নামকে দিলে ভোর‍্যা।

কিছু ফার্সী, আরবী ল্যাখ্যায়, নিজের নবাবী নাম দেখায়।···

অবশ্য অতীত ইতিহাসের অনেক ঘটনা পরবর্তী পর্যায়ে রূপ পেলে প্রধানত ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়ার যে বিপদ তা থেকে গম্ভীরা গানও রক্ষা পায় নি। তেমনি একটি মৃত্যুঞ্জয় শর্মা রচিত হোসেন শাহের বন্দনা—

নমঃ নমঃ নমঃ শিবায় নমঃ গৌড়ভগবতী
গর্ভে ধোর‍্যা রাখ্যা ছিল্যা বাদশা হোসেন মহামতি।

১. এমন রাজা আর হবে না প্রজার বহু ভাগ্যবল
ধনে ধ্যানে জ্ঞানে মানে ভাগ্যলক্ষ্মী সদা অটল।
জাত ধরণের নেই ঠিকানা হিন্দু মোসলেম জানা যায় না
কোরান পুরাণ সবই জানা, অঙ্গে ফোটে দেবজ্যোতি॥

২. যার রাজত্বে জনমিল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য
সেই যে রাজা ধর্মধ্বজা ধর্মে ছিল যার চৈতন্য।
ছিল না যার ভেদাভেদ রামরহিমে কোর‍্যা অভেদ
শাস্ত্র, কোরান, পুরাণ, বেদ কণ্ঠেতে যার অবাধগতি॥

৩. মহাভারত, রামায়ণ যার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা হল,
বৈষ্ণব কবির পদাবলী যার রাজ্যতে প্রকাশিল।
মহামহাভক্ত কবি ছিল যারা গৌড় রবি
নামকীর্তনে চিরজীবি জ্ঞান, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি॥

৪. দীনশর্মা মৃত্যুঞ্জয়ের এই প্রার্থনা ওহে হর
'কীর্তিযস্য স জীবতি' হোক যেন গৌড়েশ্বর!
প্রণমি গৌড়েশ্বরি
পুনর্জন্মে দেহ ধরি
পুণ্য এ গৌড়ভূমে হয় যেন মম বসতি!

কিন্তু সম্প্রতি হোসেন শাহ সম্পর্কে গবেষণায় জানা গেছে—আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যে বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমান নেই। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গোড়ামি ছিল তাও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হয়েছে।[৬]

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'-এ হোসেন শাহের যে চিত্র আছে তা আর যাই হোক অতিশ্রদ্ধেয় নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা সমাজে কেমন ছায়াপাত ঘটিয়েছে তার একটা চিত্র মেলে গোপাল দাসের গানে—

ক্ষুদ্র বিনাশ করতে বুঝি ধরেছ হে রুদ্রবেশ
জলে স্থলে আগুন জলে, চোখের জলে ভাঁসে (ভাসে) দেশ।

১. চীন, জাপান, জার্মান, ইটালী
মাথায় আগুন দিয়াছে জ্বালি
সবে ঋণগ্রস্ত অতিব্যস্ত
সকল দেশে মহাক্লেশ ।।

২. যুদ্ধবিদ্যা জানি না কেমন
শুনি নাই কভু কামান গর্জন
বিষবাষ্পে বোমার চাপে
মোদের দফা রফা করবে শেষ ॥

৩. নেতৃত্ব পদ ত্যজিলেন সুভাষ
আর মহাত্মাজীর বৃন্দাবনে বাস
একি হলো দশা মাছি মশা
ভনভনিতে প্রাণ শেষ ॥....

স্বদেশী আন্দোলনে ধৃত রাজবন্দীদের উপর কারাগারে ইংরাজ সরকারের যে অত্যাচার তাতে গম্ভীরা কবির মরমীয়া চরিত্রটি প্রকাশমান। ইংরেজ-বাজারের মেরাজউদ্দিনের ক্ষুব্ধ অন্তর নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে অভিব্যক্ত। এর মধ্যে অবশ্য ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন আছে সন্দেহ নেই। গান্ধীজীর বিলিতি দ্রব্যবর্জনের ডাকের প্রতি সমর্থন আছে। আছে চরকার প্রতি সমর্থন এবং পূর্ববর্তী কালের জালিযানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও দার্জিলিং অঞ্চলের চা-বাগানের শ্রমিক পীড়নের চিত্রটি তুলতে ভুল করেন নি কবি।

১

বিনা কারণে ধরে এনে এখানে কষ্ট দিচ্ছ কেন প্রাণে (হে)
কি অপরাধে রেখেছো বাঁধা কোন দোষের দোষী মোরে তুই জনে ?

২

লেকচার শুনে গান্ধীর মুখে এলাম দৌড়্যা, হে সাহেব এলাম দৌড়া
দেখছি একটা পইড়্যা আছে হাইশালের (রান্নাঘর) ঘরে ও ঢেঁকিরি ঘরে হে,
সাহেব হাইশালের ঘরে।

ঘুরলাম হে এখানে ব্যথা পালি প্রাণে
ম্যানচেষ্টার বন্ধ হল লণ্ডনে।
রাজনৈতিক বন্দী মোরা, হুজুরে রাজার হে সাহেব, হুজুরে রাজার।
কোনই দোষ করিনি মোরা, অন্যায় অত্যাচার।

ও করিনি কাউরো প্রাণ সংহার।

বন্দীভাবে জালিয়ান বাগে।

আমরা আগুন দেইনি তোপকামানে।···

সাহেব গুন্তা মারিনি চায়ের বাগানে

রোজ বিহানে (সকাল বেলা) ডাল দাও দলনে

কোন প্রাণে জুড়ো তেলের ঘাইনে (ঘান)

পশুর কাজ করাও মানবগণে

সাহেব! এই প্রজা আছে কি তোমার লণ্ডনে?

মোহাম্মদ সুফীর একটি গানে দেখি এমনি বিক্ষোভ—

আর কতকাল, হে মহাকাল

থাকবা বসে যোগে।

গা তোল—উঠেছে সব জেগে

হিন্দু মুসলমান মেথর ডোম

খেলাপৎ (খিলাফত আন্দোলন) কমিটির চর্চা

উঠেছিল পাঞ্জাবে।

শুনতে পেয়ে ইউরোপ বাসী

কামান গোলা এনে রাশি রাশি

তোপেতে লাগিয়ে দিয়ে আগুন

সকলকে করলে পোড়া বাগুন

ইংরেজ সরকার অকারণে

মারল প্রাণে

ঘেরে জালিয়ান বাগে

গা তোল উঠেছে সব জেগে।···

বিশ্বনাথ পণ্ডিতের একটা গানেও তেমনি শোষনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা—

এরা পেয়ে মোদের হাতে

মারল কাপড় ভাতে

ফেইলা দিয়া মুলুক শুদ্ধা টান।

চিতানি/ মোদের রাইখ্যা ভুক্কা

পাঠায় লুক্কা বিদ্যাশেতে চালান।

ছুঁচা ইঁদুর আর টিকটিকি লিতে…
আউলখার্না আর লিব হাল জুয়ালি ॥

আরও একটা মোহাম্মদ স্ফীর গান—

তুমি ঘুসির (ঘুঁটে) আগুন, তুঁষের ধোঁয়া লাগিয়ে দিলে বঙ্গে।
আজ হাবুডুব খায় ভারতবাসী, স্বরাজ তরঙ্গে
হালচাল করে বঙ্গের মাটি
বুঁদলা (রোপন করলে) গোপাল ভোগের (একধরনের আম) আঁটি
তাতে ফল ফলিল তরমুজ ফুটি
আলু পটল ঝিঙে।

বঙ্গমাতার সুত-সুতা দেশের মাঝে সাজলো নেতা
আজ পিঠে তাদের রুলের গুঁতা দিতেছে শ্বেতাঙ্গে।

ইংরেজ রাজত্বে যখন দশটাকা ও একশত টাকার নোট প্রথম চালু হল তখনও গম্ভীরা শিল্পীরা পিছিয়ে থাকে নি। পুরনো যুগের রৌপ্য মুদ্রার প্রতি আগ্রহে নতুনকে সাদরে বরণ না করায় হয়ত প্রগতিশীল চিন্তাধারা নেই তবুও গ্রাম্য কবির যুক্তি, যা সাধারণ মানুষ অনুভব করেছিল তা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

নতুন টাকার গান। (সাহেবের নিকট একজন চাষীর গান)

সাহেব ধরিয়ে লাঙ্গল কলার গাছ হে
নাচাছিস্ বেশ ভালুক নাচ হে
সোনার ভারতে, দোকান আড়তে
চাঁদির বিনিময়ে কাঁচ হে। (ধরালি……)

(১)

মাত্র আধা পয়সার কাগজ হে
কত রঙ বেরঙ দেখি তাহার মাঝে
লক্ষ টাকার মূল্যে বঙ্গে বিরাজে
বেশ কর্যাছিস্ রাজার চাঁচ হে। (নাচাছিস…)

(২)

এই দেশের পাথীতে করেছে নির্মাণ
পারে কি কারিগরিতে চীন-জার্মাণ ?

সকল দেশের ভাষা, জানেন বাবু বর্মাণ[৭]
শুধা গিয়ে ঝুট কি সাঁচ হে !

(৩)

সাঁইত্রিশ টাকা দরে চড়িয়ে সোনা
নিতে পারলি না ভারতের এক কণা।
ভারত শিরোমণি, সবদেশেরই জানা
রাজায় রাজায় লাগায় প্যাঁচরে। (নাচাচ্ছিস···)
(মোহাম্মদ সূফী রহমান)

এই 'ডুয়েট-এর দুটি চরিত্রের সংলাপে ধৃত গানটি অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছে।

আবার দেশের সাম্প্রদায়িক সংহতি যখন হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বে ক্ষুন্ন হওয়ার উপক্রম তখন মুসলিম গম্ভীরা কবি শমীর খলিফা মিলনের গান গাইলেন। এর প্রেক্ষাপটে একটা ঘটনা স্মরণপথে রাখা দরকার। কোন এক সময়ে মহরম ও গম্ভীরা একই সময়ে হয়েছিল। মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাওয়ার সময় গম্ভীরার ঢাকবাদ্য ও নৃত্য হয়। বজরাট্যাক গ্রামের মুসলমানেরা গম্ভীরার ঢাক ভাঙ্গে, হিন্দুরাও তাজিয়া ভাঙ্গে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শমীর খলিফার গান—

ওহে শিব নিরঞ্জন, কুন ফ্যাসাদে ফেললা তুমি হায় !
এযে মিলন দড়ি ছিঁড্যা দিয়্যা তাজিয়াতে কাজিয়া লাগায় ॥
এ যে হিন্দু-মুসলমান ছিল এক আসনে থান।
গলাগলি পিরীত করতো, গাইতো গম্ভীরা গান।
(এখন) দেখছি ঢাকভাঙ্গা আর তাজিয়া টান।
ডাঙাতে ডিঙা ডুবায়।

২. ধর্মের ভাই বলিহারী
ধর্ম্ম লিয়া চলছে কিসের আড়াআড়ি ?
আল্লা ঢাকের বোলে চাট্টি তোলে
আজানে কীষ্ট পালায় ॥

৩. কুঠে আল্লা ভগবান কুঠে আছে আন্তের থান
মন্দিরে কি মসজিদেতে পূজা সিন্নি খান
তোমার নূরে কি টিকিতে বোস্তা তসবীর কি মালা ঘুরায় ?

৪. শুন্যাছি যবন হরিদাস ছিল চৈতণ গোঁসার দাস
হরি আল্লা একই ভাব্যা নস্তাৎ করলে বাস।
শ্যাযে কাজীর বিচার হার মান্যাচে, দেখ্যা অর উপাসনায়।

৫. যত ওপরে যাব ভাই জাত কোহতে নাই
একের জন্য সবাই পাগল,একে চাহে সবাই।
যত নীচের পাগল হয়্যা ছাগল ধর্মেতে শুধু ধাঁধায়।

৬. চাঁদ, সুরজ তোমার এক নদী, বাতাস, আগুন এক।
দুনিয়ার মানুষ দ্যাখছে শুনছে খাচে নিছে
ঐ একজনারই সিজ্‌জন করা সারা দুনিয়ায় একজনাই।

৭. শিব মিটাও গণ্ডগোল লাগাও আজান, ঢাক আব ঢোল
আল্লা আল্লা হরি হর ধর সবাই বোল।
একলা খলিফা শমীরকে হাজির রাখো তোমার গম্ভীরায়।

একই ভাবে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা লিখেছেন আরও অনেক গম্ভীরা কবি। জাতি বৈষম্যের ব্যপারে তাঁরাও ব্যথাতুর।

হায়রে আল্লা কি হোল, হিন্দু মুসলিম দুই মলো।
(দেখেছি) জাতিয়ারী জাতিয়ারী কোব্যা দাঙ্গাহাঙ্গামায় পোল।
মুসলিম কোহছে হাম বাড়া হিন্দু দেয় নাকো সাড়া
ভোলা তোমার দেশে একুন ভেসে দোটানা ভাব দাঁড়ালো ?

আবার বিধবা বিবাহের সমর্থনে গোপাল দাসের গান—
স্ত্রী মারিলে সুখের তরে পুরুষ কেন বিহা করে
রাড়ী হয়্যা থাকবে সদা নারী কার তরে
এ কোন দেশী ধর্ম দেখ ভাবিয়ে রে।

বাতাস ও বন্যার আবির্ভাবে বিপর্যস্ত গণজীবনের হাহাকার—
এবার কি খাবা, যে বাবা, পুয়াল চাবাও বইসা।
কোন মুলুকের বন্যা এলো মোর বাবা হে—
দোর বান্ধি হে।
কোন দোখ্‌না বাতাস আইসা হে পুয়াল চাবাও বইসা
আমের গাছের ডালটা খাড় ভাদই ধানের আশা ছাড়

ভাতিয়ার বিল হাতিয়ায় নিলে মোর বাবা হে
দোর বান্ধি হে।

কোন দোখনা বাতাস আইসা হে পুয়াল চাবাও বইসা।

অথবা রেশমের গুঁটি পোকা 'পলুর' দরের নিম্নগতি, চালের উর্দ্ধগতি। যেহেতু এখানে রেশম বা পলু অর্থকরী ফসল, সেই হেতু তা নষ্ট হওয়ায় জন-জীবনের দুর্দ্দশার রূপ নিয়েছে নিম্নোক্ত গানটি—

শিব হে, কি করিব হে এবার বাঁচবে না আর প্রাণ
টাকা স্যারের চাউল হয়্যা লাইগ্যা গ্যাল টান
বাঁচবে না আর প্রাণ।
হামাদের দ্যাশের আম্র ফলটি সেও হল মাটি
পলু-পুষ্যা পাছি দিশা দর হল খাঁটি হে।
দর হল কুড়ি পঁচিশ পলু পুবা লাগছে যে দিস
এ ক্যামন হল দ্যাশের ধারা, বল বাঁচব ক্যামনে মোরা।
কৃষকেরা ভাবছে বইস্যা উপায় কিবা করি হে
ধান কালাই হল না ভাই, হল না জল ঝড়ি হে
জল বিনা সব মইল গরু-বকরী এ কি হোল বিষম জ্বালা
ক্যামনে বাঁচবে ছেইলা পিলা·······

সমাজ জীবনে সুরাপানেব কুফলও চিন্তান্বিত করেছে শিল্পীদেব—

মালদার আকবারীর (আবগারী) দোকানে
পয়সা লোকে নাহি চিনে
নিজের পয়সা দিয়ে অকারণ
মিছে পাগল সাজে
চল দেশের কাজে, মর কেন লাজে।
দেশের লাগিয়া, নিয়্যা যাও বাঁধিয়া
মোদেরকে কোনখানে ?
হয়ে তারা আত্মহারা, নেশায় মজে থাকে
পিয়ে লেও পিয়ালা, রঙ সে বেরঙ
এক পেয়ালা, পিয়ে লেও দোস্ত
তবুর হোগা চল্‌।

মদ্য বর্জনের যে ডাক গান্ধীজী প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে দিয়েছিলেন তারই পট-

ভূমিকায় মেথর-মেথরাণীর হিন্দী-বাংলা মিশ্রণের সংলাপে একটি নাটিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে নিম্নোক্ত গানে, এখানে মেথর গান্ধীর বাণীকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, কিন্তু মেথরাণীর নিকট দোকানদারের নববর্ষের হালখাতার 'নাড়ু খিলানো' অনেক বেশী আনন্দবর্দ্ধক ও আকর্ষণীয়—

মেথর / বাবু, ভজাইছে নাই গান্ধী গুরু
মাৎ দিহীন্ দোকান্‌মে ঝাড়ু
মেথরাণী / হাম্মা দেবাই তো দোকানমে ঝাড়ু
হালখাতা মে খিলাল কো লাড়ু
মেথর / শুনবিনি হাম্মার বাত
মারবো উঠাকার লাথ
ফ্যোরি (ভেঙ্গে দেওয়া) দেবো হাতাকে খারু (হাতের চুরি)

এইভাবে দেখা যায় যে জনশিক্ষায় গম্ভীরা গান .এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে।

১. ঘোষ প্রদ্যোত—গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব / একাল ও সেকাল পৃ—৩৪-৩৫
২. তদেব পৃ — ২৯-৩০
৩. ভট্টাচার্য আশুতোষ—বাংলার লোকসাহিত্য, তৃয়, পৃ—২৪৩
৪. ঘোষ প্রদ্যোত—গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য, প্রথম পর্ব, পৃ—৪১-৫২
৫. প্রাগুক্ত—পৃ, ও Nik Douglas, Tantra Yoga. P. 2
৬. মুখোপাধ্যায় সুখময়—বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর / স্বাধীন সুলতানদের আমল, ২য় সং পৃ ৩৯৩—৪১১
৭. ইংরেজবাজারের ক্ষিতীশ বর্মণ বহুভাষাবিদ ছিলেন।

রচয়িতা ও শিল্পী-

গম্ভীরা গানের আদিকালের রচয়িতাদের নাম পাওয়া যায় না কারণ এগুলি লোকসঙ্গীত। নামহীন 'এ' গান। যে নামগুলো পাওয়া যায় সেগুলি এ শতাব্দীরই অর্থাৎ ৭০/৮০ বছরেব মধ্যেকার। উল্লেখযোগ্য রচয়িতাদের মধ্যে আছেন সাহাপুরের হরিমোহন কুণ্ডু, ইংরেজবাজারের মোহাম্মদ সুফী, মোহাম্মদ সোলেমান, গোবিন্দলাল শেঠ, মেরাজউদ্দিন, আবুল হোসেন, আকবর খলিফা, শরৎ পণ্ডিত (ভট্টাচার্য), ধরণীধর সাহা, গোপাল দাস, কিশোরী পণ্ডিত, ঠাকুরদাস দাস, মনোরঞ্জন দাস, শরৎ দাস, আইহো-মুচিয়া অঞ্চলের কৃষ্ণদাস, গোলাম গুপ্ত, ব্রজলাল পসারী (গুপ্ত) বিপিন খলিফা, শশী ডাক্তার বা ইমরৎ হোসেন চৌধুরী, সতীশ গুপ্ত (কবিরাজ), ইন্দ্রদমন শেঠ, ভূপেন সাহা, জীবন হালদার, মৃণালকান্তি রায়, হাজারী বসাক, বনমালী দাস, মাধাইপুরের মাধাই গোঁসাই, ভোলাহাটের ধর্মদাস মণ্ডল, গয়েশপুরের বামনবিহারী গোস্বামী, গিলাবাড়ীর গোষ্টবিহারী বাণিজ্যা, নীলকণ্ঠ দাস, ধানতলার গদাধর মণ্ডল, বজরাট্যাকের শমীর খলিফা, অমৃতির বিষ্ণুপ্রসাদ নাগর, মহদীপুরের ধনকৃষ্ণ অধিকারী, মৃত্যুঞ্জয় শর্মা, শ্রীরূপ খলিফা, মধুসূদন খলিফা, বসন্ত মজুমদার, মহেশপুরের গোপালচন্দ্র দাস। অধুনা আইহোর রজনী সরকার, উপেন্দ্র কর্মকার, সুদর্শন শেঠ, বিনয় গুপ্ত, কালীপদ গুপ্ত, ইংরেজবাজারের বিশ্বনাথ পণ্ডিত, গোপীনাথ শেঠ, রাম পণ্ডিত, ধরণী সাহা, দেবনাথ রায় (হাবলা), তুকডিলাল চৌধুরী, ডাঃ দেবপ্রসাদ সাটিয়ার, জোত-আরাপুরের মৃত্যুঞ্জয় হালদার, ও মুচিয়ার তারাপদ লাহিড়ী (অধুনা কলকাতাবাসী)র নাম উল্লেখ্যযোগ্য। বর্তমানে শ্রেষ্ঠ রচয়িতা গোপীনাথ শেঠ। আগেকার শিল্পীদের মধ্যে হরিদাস দাস, রাধানাথ কুণ্ডু, কুতুবপুরের অমরনাথ মণ্ডল, আশুতোষ ঘোষ, হরিবল সাহা (হরিবোলা), নগরা, কিনু হালদার, মুচিয়ার ভ্রাতৃদ্বয় কালুয়া বিশুয়া উল্লেখ্য। আধুনিক কালের প্রবাদ-শিল্পী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মটর)। তিনি অসুস্থ সুতরাং এখনকার শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিরু (নির্মল দাস)। এ ছাড়া জোতের বীরেন ঘোষের নাম করা যেতে পারে।

গম্ভীরা ও আলকাপ

আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুতে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনীতি বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করায় তার সার্বজনীনতা ও আবেদনও হল ব্যাপক, কারণ ধর্মীয় আবেদন বেশীদূর এগুতে পারে না—জাতি-ধর্মের চৌহদ্দীতে তা আটকা পড়ে যায়। গম্ভীরার এই ধর্মের বন্ধন মুক্তির ইতিহাসে মোহাম্মদ সূফী রহমানের নাম শ্রদ্ধাব সঙ্গে স্মরণীয়। এই উদার মুসলিম গম্ভীবা কবি শুধুমাত্র শিব-বন্দনা ও কৃষিব্যবস্থার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইলেন না, যে বাজনৈতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ জনজীবনকে তীব্রভাবে প্রভাবান্বিত কবেছে—তাকে প্রকাশ করলেন। সমাজ জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি, সুবিধা-অসুবিধা, সমস্যার হাজাব জগদ্দল পাথব যে চেপে বসেছে তার কথা জানালেন। এরই পাশে মালদহ-মুর্শিদাবাদ জেলার আর এক লোকনাট্য আলকাপও বর্তমান। এব বিষয়বস্তুও সামাজিক। কিন্তু এটি কেবল মাত্র মুসলমান সমাজেই প্রচলিত, যদিও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই গম্ভীরার মত এর রস গ্রহণ করে। হিন্দু গায়কও এতে আছে।

আলকাপ শব্দটি আরবী শব্দজাত, শব্দটির অর্থ মস্করা, ঢঙ বা কৌতুক। এর মধ্যে রঙের প্রাধান্য আছে। এটি এক জাতীয় পালাগান বা লোকনাট্য। গ্রাম্য গাথা, উপকাহিনী বা সাধারণ সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলকাপ গান রচিত হয়। পালাগানের অনেকগুলি ভাগ আছে—পালাবন্দনা, টপ্পা, বাবোয়াবী, সালতামামি, ধূয়া, মজামারা খেমটা ও আলকাপ।

আলকাপে গম্ভীরার মত বন্দনা আছে। আছে শিব বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, গণেশ বন্দনা, কার্তিক বন্দনা। এর রচয়িতাকে বলে 'খলিফা।' অনেক খলিফা আবার গম্ভীরা গান রচনাও করেছেন। অর্থাৎ এই দুটি লোক সঙ্গীত ও লোক-নাট্য পাশাপাশি থাকাতে উদার আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়াতে সাম্প্রদায়িক প্রীতির বাত্যাবরণ লক্ষ্য করা যায়।

বছর ৪৫।৫০ আগে আলকাপ ও গম্ভীরার সুর প্রায় একই ছিল। খ্যাতনামা শিল্পী অমরনাথ মণ্ডলই গম্ভীরাকে বিলম্বিত লয়ে গেয়ে আলকাপ থেকে পৃথক-ভাবে চিহ্নিত করেন। গম্ভীরায় যেমন আলকাপের সুর সংযোজনে লোহারাম খলিফা স্মরণীয়, তেমনি অমরনাথ গম্ভীরা ও আলকাপের পৃথকীকরণে শ্রদ্ধার্হ।

আলকাপে শিবের কথাও এসেছে অন্যান্য দেবদেবী রাধাকৃষ্ণের নামের সঙ্গে সঙ্গে। ঢঙটির সঙ্গে গম্ভীরার মিল আছে—

> তোর মাথায় দেখি সাপের ফণা, ও ভোলানানা
> তুমি হর, তুমি হরি, তুমি জগৎপতি
> কৈলাসধাম ছেড়ে, কেন শ্মশানে বসতি……

আলকাপ অনেকটা ময়মনসিংহ গীতি কবিতার বিষয়বস্তুর মত। ইদানীং পাত্র-পাত্রী সেজে অভিনয় করে, দোহারকেও থাকে। বাঁশী, হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, জুড়ি ও ঢোল এর বাদ্য যন্ত্র। যাত্রার ঢঙ এখানে সুস্পষ্ট। আলকাপের প্রধান দুটি অংশ—গান ও ছড়া। এ ছড়া সাধারণ ছড়া বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়। ছড়া অংশ সমসাময়িক নানা লঘু বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে মালদহে গম্ভীরা ও আলকাপ পাশাপাশি থেকে অনেক স্থানে একে অপরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু গম্ভীরার মত সার্বজনীনতার ক্ষেত্রে আসতে পারে নি আলকাপ।

আলকাপে হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সরস করে তোলা হয়। এখানে স্থূল হাস্যরসের প্রাধান্য। নৃত্যে খেমটা বড্ড বেশী প্রকট। তাই তা শহুরে শিক্ষিত চোখকে পীড়া দেয়।

মালদহ জেলার সুজাপুর, কালিয়াচক, মানিকচক, প্রভৃতি অঞ্চলে আলকাপের ব্যাপক প্রচার থাকলেও গম্ভীরার ন্যায় ব্যাপক আবেদন তার নেই একথা স্বীকার করতেই হয়।

আলকাপ বেশীদূর এগোয় নি তার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে। গম্ভীরা সে দিক থেকে প্রগতিবাদী, কারণ কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে সে এসেছে একেবারে আধুনিক জনজীবনের সমস্যা ও রাজনীতির হাল আমলের প্রেক্ষাপটে।

মূল গান সুরু হওয়ার আগে আলকাপে বন্দনা গাওয়া হয়। তবে তা গম্ভীরার শিব-বন্দনার মত নয়। রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতার গানও হতে পারে। ছড়াদারেরা গান গাইতে সুরু করে ছড়া বলে ও মধ্যে মধ্যে হাস্যরস বা কমিক (comic) বা রঙ (তামাসা) দিয়ে আসর জমিয়ে তোলে। যেমন—

নারী / আর কতদিন থাকবো বন্ধু তোমারি আশায়।
বিরহেরি এত জ্বালা আর কি সহা যায় ?
চাকরী কর মিলিটেরী আমায় করে পর

একলা ঘরে কেমন করে থাকবো ছেড়ে বর
আমায় নিও সঙ্গে করে হে ।।

পুরুষ / কেঁদ না, কেঁদ না ধনি, করবো না রে পর
ক্যাজুয়াল লিভের পাব ছুটী, আসব ত্বদিন পর
শোনেক শোনেক সোনার কন্যা হে ।।

নারী / পরাধীন হয়েছ বন্ধু, ছাড়বো নাকো আর
সঙ্গে ধাব, জড়িয়ে বব হে বন্ধু, ভাড়া নিয়ে ঘর
সঙ্গে সঙ্গে রইব বন্ধু হে ।

পুরুষ / পরাধীনের এত জ্বালা কি বলিব আর
ডিউটি নিয়ে থাকি কন্যা, তোমায় করে পর
এবার ছেড়ে দিয়ে আসব কন্যা হে ।......

এখানে বিরহের চিত্র স্বামী-স্ত্রীর সংলাপে বিধৃত। লোকায়ত জীবনের এমন চিত্র ভাট গীতি ও ময়মনসিং গীতিকাতেও লভ্য ।

আলকাপে পালাগানও দেখা যায়। এমন কি সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়েও রচিত হয় তা বটে কিন্তু গৌণ। এখানেও ব্যাখ্যা লভ্য অর্থাৎ লোকনাট্যের চিত্র বর্তমান। কিন্তু গম্ভীরায় গায়কদেব ব্যাখ্যা মুখ্যতঃ Satire প্রধান তবে Humourও অনেক স্থানে বর্তমান। এখানে হাস্যরসের ধারার Pun, Jest, mockery আছে বটে কিন্তু আলকাপে Baffoonary ও Lampoon এর প্রাধান্য বেশী।

হিন্দুর পুবাণ মুসলিম কবিদের হাতে পড়ে আলকাপে নতুন রূপ নিয়েছে। হয়ত গম্ভীরা গানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবার জন্যই মুসলিম বচয়িতাদের আলকাপ সৃষ্টি। কারণ লোকসঙ্গীত হিসেবে সে গম্ভীরার অনুজ, কিন্তু আজকের প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত গম্ভীরা গানের সুবে যে প্রভাব তা আলকাপেরই। পূর্ববর্তী পযাযে আমরা দেখেছি যে প্রায় ৬০/৭০ বছর আগে মুখ্যতঃ ইংরেজবাজার থানার অমৃতি গ্রামের লোহারাম খলিফাব সুর ও অন্যান্য দলেব উপভোগ্য সুরগুলির সমন্বয়েব মাধ্যমে আজকের প্রতিষ্ঠিত সুরেব জন্ম। আলকাপের সুর থেকে গম্ভীরাব সুব এসেছে এটি প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সত্তর বছর আগেও (১৩১৯) প্রয়াত হরিদাস পালিত গম্ভীরার গীতিকাবকে খলিফা বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু খলিফা শব্দটি মুসলিম প্রভাবে জাত এটি

আমরা দেখেছি আগেই। আলকাপ মুসলিম সমাজেই জন্মলাভ করে বলে গম্ভীরা গানে তার প্রভাব এসেছে এটি খুব সহজেই মেনে নেওয়া যায়।

আসলে বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত গম্ভীরা গানে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য না থাকায় আলকাপ গায়কেরাও গম্ভীরা মণ্ডপে গান গাইতে আসতেন। দু' চারটি গম্ভীরা গানও আলকাপের সঙ্গে রচনা করতেন। কিন্তু সুরের বৈচিত্র্য সেখানে ছিল না। পূর্ববর্তী যুগের শিববন্দনা বা 'খবর' জাতীয় গানে সুরের বৈচিত্র্য ছিল না। আজকের গম্ভীরা গানের সুরের বৈচিত্র্য ও আমদানি আলকাপ থেকে হয়েছে এটি স্বীকার করতেই হয়। অনেক আলকাপ গায়ক পরে মুখ্যতঃ গম্ভীরা গায়ক-লেখকই থেকে গেলেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে গম্ভীরা ও আলকাপ যেমন একে অপরকে প্রভাবান্বিত করেছে, তেমনি সমগ্র বাংলার প্রায় সব লোকসঙ্গীতই হিন্দু-মুসলমানের দানে পরিপুষ্ট হয়েছে। উৎসে হিন্দু বা মুসলিম গন্ধ থাকলেও রসগ্রহণ উভয় সম্প্রদায়ই করে সমান ভাবে, সে হিসেবে লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যই সাম্প্রদায়িক মিলন-সেতু রচনা করে এবং তার ব্যাপক চর্চা, প্রচার ও প্রসার সাম্প্রদায়িক বিষ-বীজকে ধ্বংস করতে সক্ষম এ কথাটি সকল শুভবুদ্ধি মানুষেরই থাকা সমীচীন।

গম্ভীরা গানের ভাষা

মালদহ জেলায় বহু জাতির বাস। এর মধ্যে উপজাতিও কম নয়। বহু ভাষার মিশ্রণে একটা গ্রামের পাশাপাশি অনেকগুলি পরিবারে পৃথক পৃথক ভাষা প্রচলিত। বিহার সংলগ্ন হওয়ায় হিন্দী, খোট্টাও এসেছে, মৈথিলীও আছে। রাজবংশী পালিয়াদের ভাষার প্রভাব কিন্তু এখানে বেশী। মিশ্র ভাষা তাই এই জেলার কথ্য ভাষা। কথ্য ভাষায় মূলতঃ বরিন্দ এলাকার ভাষা এবং রাজবংশী প্রভাবান্বিত। বিশিষ্ট সুরের টান এখানে লক্ষ্য করা যায়। যেমন করেছে —কর্যাছে, হয়ে—হয়্যা। দ্বিরুক্ত স্বরও লক্ষণীয়। যেমন—জুতা—জুত্তা, কবর—কব্বর, ড এর স্থলে ঢ় এর ব্যবহার – যেমন বুড়া—বুঢ়া ; ক এর স্থলে খ, যেমন —নাকো – নাখো। নাসিক্যধ্বনির ব্যবহারও বর্তমান—যেমন পা—পাঁ বা পাঁও, বেশ—বেঁশ, ভেঁস।

এই ভাষায় এবং শব্দ সম্ভারে যে লোকনাট্য গম্ভীরা সৃষ্টি হয় তার আবেদন এ জেলাবাসীর নিকট যত আকর্ষণীয়, তা অন্যত্র হবে না—এটা বলাই বাহুল্য। মালদহের চৌহদ্দীর বাইরের মানুষ যাতে এর শব্দ সম্ভার সম্পর্কে একটা সাধারণ

ধারণা করতে পারেন, তার জন্য আমরা গান-সংকলন অংশে কিছু অর্থও দিয়েছি। জেলার এই শব্দ-সম্ভার গম্ভীরা গান থেকে ইদানীংকালে অন্তর্হিত। তবু কয়েকটি অতিরিক্ত শব্দ আমরা নীচে দিচ্ছি।

ল্যাহলা—বোকা, দূন—পরাজিত, মাকড়া—মাকড়সা,তেলপাট—মোসাহেবী কবা, আলকুটানে—অভিমানী, পশারহাট্টা—দশকর্ম ভাণ্ডারের মত দোকান, তেলচাট্টা—আরশুলা, হালাকান—পরিশ্রান্ত, আলবেলি—বাহারে সাজ, খাট্টা—বিরক্তি, বেহুঁস্যা—কাণ্ডজ্ঞানহীন, আকাম্বা—অকর্মা, ব্যাসর—নোলক জাতীয় অলংকার, তরপান—গর্জন, কাচ্চি পাক্কি—কাঁচাপাকা, মাট্কা প্যাটা—মোটাপেট ধারী, গুদবী গুদরা—ছেঁড়া কাপড, কল্লা—বদমাস, ছিক—হাঁচি, ফোতা—ছোট গায়ের চাদর, দোপর—গায়ের মোটা চাদব, আনমাক্কা—যে অন্ধের মত চলাফেরা করে, খাপসন্নী—কুঁদুলী, আলকোটান—যে না জানার ভান করে, ডাং—মারকুটে/গুঁটি, গোটি—ল্যাটামাছ, পুয়াল—পল বা খড, লেঢ়ু—বাছুর, ডহব, গোপাট—লোকালয় ভূমি হতে গোচারণ পর্যন্ত গোমহিষাদির চলার পথ, প্যাচ্চর—শয়তান, শুখ্যা—যে না খেয়ে পয়সা নিয়ে বাড়ীতে কাজ করে, নিচ্চোড ঋণ করে যে পরিশোধ করে না, বহিরা—বধির,লাদম্বরা—জড়বুদ্ধি সম্পন্ন,গাজোল, ঝাকসা—দীর্ঘদিন বৃষ্টিপাত, ভাতধুনা—যে পরজীবী, লাহারি—চাষীদের প্রাতঃ কালের জলখাবার, খন্তারাম—দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ, লাথকুচ্চা—বেহায়া, হেককট—যে কথাবার্তা শোনে না, হেহু—নির্বোধ, ভুরকুট—ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলফা—যা বিনা কষ্টে পাওয়া যায়, ঢাকনমুখা—কদাকার, গেঁহু—গম, ফুটনিরাম—চালিয়াৎ।

উখড়া—মুড়কি, হিলা—নড়া, খোদরা বোদরা—অমসৃণ, কুয়া ফাটা—সকাল হওয়া, সারাণ—পথ/চিপ্পা, কাইন্না, কিচ্চিন, কাঞ্জুষ, কিঠাই, কাইঠা, কষসা—কৃপণ; গুল্লা, দরাজ, দরিয়া—উদার; কুটনি, তুকলিখোর—নিন্দুক, লদবদ—খারাপ, চিকাস—উষাকাল, গিদোড়—শিয়াল, সোদ—সরল, সাদা, শান্ত/আউলা মাক্কা—বাজে কথা।

গম্ভীরার সঙ

নাটকীয় ভাব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সার্বজনীন মাধ্যম হল সঙ। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, পদক্ষেপও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে একটা বিষয়কে দর্শক ও শ্রোতাদের নিকট উপস্থিত করা সঙের লক্ষ্য। গত কয়েক শতকের লোকসংস্কৃতির

এক বিশিষ্ট চিত্তবিনোদনের ধারাই হচ্ছে এই সঙ।[১] গান ও ছড়ার মাধ্যমে বিশেষ ব্যক্তি ও সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি রঙ্গরসিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতো এই সঙেরা। অবিভক্ত বাংলার গানের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানের সঙগুলি সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য—

১. কাঁশারী পাড়া ২. আহিরীটোলা ৩. জেলেপাড়া ৪. খিদিরপুর ৫. পদ্মপুকুরের গোষ্ঠমেলা ৬ তালতলা ৭. বেনেপুকুর ৮. শিবপুর ৯. খুরুট ১০. কাস্থন্দিয়া ১১. বাস্তুবাড়ী ১২. জনাই-বেগমপুর ১৩. শ্রীরামপুর ১৪. মেদিনীপুর ১৫. বীরভূম ১৬. চব্বিশ পরগণার নিশ্চিন্তপুর ১৭. ঢাকা ১৮. চুঁচুড়া ১৯. হুগলীর হরিপালের তালদহ[২]

সঙ কথাটি সংস্কৃত সমাঙ্গ থেকে এসেছে বলে আচার্য সুনীতিকুমার জানিয়েছেন।[৩]

রোমক নাট্যরীতিতে সঙের ন্যায় অঙ্গভঙ্গীতে বোঝানর ব্যবস্থা ছিল। ইতালীর মুখোশ রঙ্গ নাট্য (masked comedy) তে অনুরূপ অঙ্গভঙ্গিরই একটা রূপ আমাদের দেশের সঙ। পুজা-পার্বণ উপলক্ষে এই সঙের ঘটনা সংবাদ-পত্রেও ফলাও করে ছাপা হোত এক সময়[৪]। সঙ এত জনপ্রিয় হয়েছিল এক সময়ে যে যাত্রার আসরে সঙের নাচ-গানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় কোথাও কোথাও[৫]। ছবিও ছাপা হত বহু ভঙ্গীর।[৬]

'সঙ' আজ প্রায় অবলুপ্তির পথে। প্রায় বেরোয় না ইদানীং কালে। আগে গম্ভীরা পূজার চতুর্থ দিনে সঙ বেরুতো। ইদানীংকালে কেবল মাত্র ইংরেজবাজারে প্রতি বছর ১৬ই বৈশাখ বের করে রাম পণ্ডিতের দল।

প্রায় তিন দশক আগে মটর ইংরেজবাজারে সঙ বের করেছিলেন। একটা ছাগলের গায়ে চাকা চাকা লাল ছাপ দিয়ে তাঁকে সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করান। উৎসুক জনতাকে বলতে থাকেন—'এই চকরা বকরী সমস্ত বাঁদর খ্যায়াছে।' রসোপলব্ধির জন্য এর পূর্ব ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

ননী চক্রবর্তী নামে এক শিকারী মালদহের বানরকুলকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেন বন্দুকের গুলিতে এবং সরকার কর্তৃক পুরস্কৃতও হন। কারণ বানরকুল মালদহের শস্যাদি উদরস্থাৎ করছিল।

এই ঘটনার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ যাই থাকুক না কেন, নিরীহ শাখা-মৃগদের বর্বরোচিত নিধনে লোকসমাজ ব্যথিত হয়েছিল। এখানে চক্রবর্তী হলো চক্‌রা বকরী (ছাগল)।[৭]

মালদহের আইহো অঞ্চলে ঝাপুর পালের ও ওখানকার জনৈক জমিদারের অপকীর্তিও এক সময়ে সঙের মাধ্যমে রূপ পেয়েছিল।[৮]

সঙের মিছিল দুভাবে চিত্রিত হয়। প্রথম রূপটা আগেই আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় রূপ 'নৌকায় মিছিল'। এটি ইংরেজবাজারে দেখা যায়।

বাঁশের বাখারীর উপরে কাপড় দিয়ে বড় নৌকার মত করা হয়—তার নীচে উপরে ফাঁকা। মধ্যে অনেকগুলি চরিত্র থাকে। থাকে নর্তকী ও গায়কেরা। ৫।৬ জন সেই নৌকা ঘাড়ে করে নিয়ে যায়। নৌকার গায়ে কাঠ দিয়ে তাল ঠোকে গায়কেরা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে থাকে হারমোনিয়াম, ঢোল ও করতাল, সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে এই সঙের মিছিল।

গম্ভীরার সঙের গান / রামকিঙ্কর পণ্ডিত

আমাদের এই ছোট তরী উজান-ভাঁটি যায়।
মনের আনন্দে নৌকা গড়িলাম রে-ওরে ভাই ॥
মালদা টাউনের খবর, জানাই সব জবর।
দয়া করে আপনারা শুনুন ভাই সবাই ॥

১. কাঠের তৈরী, কাঠের বৈঠা, কাঠের হাল হয় ভাই।
বাদাম তুলিয়া চলে, তালে তালে যায় ॥

২. পৌরসভা এই সহরে, উন্নতি করে।
যেথায় সেথায় রাস্তা খুঁড়ে রাস্তা চলা দায় ॥

৩. দলাদলি মারামারি, চলে সদাই হুড়াহুড়ি।
দেখাইয়া বাহাদুরী, টাকা মেরে খায়।

৪. কহি সেনেটারী অফিসার, ত্যাখেন কি টাউন ঘুরে
বসে বসে অফিস ঘরে, ডুব দেয় নর্দমায়।

৫. জেলার সদর হাসপাতাল, হয়ে আছে মহা কাল।
রুগীরা হয় নাকাল, ঔষধ বিনে মারা যায় ॥

৬. সরকারী এলেকট্রিক সাপ্লাই, গুণের তাদের অন্ত নাই।
জ্যোৎস্নারাতে আলো জ্বালায়, আঁধারে নিভায়।

৭. চুরি করে গুণ্ডা চোর, আলোর দয়া এদের উপর।
সাথে পুলিশ যোগ দিয়ে, চুরি সে করায় ॥

৮. এই জেলার পুলিশ সুপার, করে অন্যায় ব্যবহার।
রেগে গিয়ে পুলিশের, লাথি চড় লাগায় ।।

৯. কম্পেনশেসন অফিসার, স্বয়ং গৌরাঙ্গ অবতার।
গভীর জলে করেন শিকার, ধরা বিষম দায় ।।

১০. সাপ্লাই অফিসের কথা, আছে বহুকীর্তি গড়া।
হলে পরে এদের দয়া, নিস্তার আর নাই ।।

১১. পোষ্ট আপিস সৌখিন হয়ে থাকে উদাসীন।
বাড়ীর পাশে একমাসে চিঠি পাওয়া যায়।

১২. টাউনের ব্যবসায়ী যারা. হুজুগেতে মাতে তারা।
বাজেটের কথা শুনে, মালপত্রের দর বাড়ায়।

আবার গরুরগাড়ীর উপরে শিব-পার্বতী সেজেও সঙ বেরোতে দেখা যেত কখনও কখনও। শিবের উদ্দেশ্যে দুঃখ-দুর্দশার অনুযোগ-অভিযোগ উত্থিত হয়। এতে স্থানীয় এবং মূলতঃ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্রই তুলে ধরা হয়। রাজনীতির কথা এখানে অনুপস্থিত থাকে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গম্ভীরার সঙের গান রিপোর্ট বা খবর জাতীয় গানেরই একটা দৃশ্যসঙ্গীত।

পূর্ববাংলা : গম্ভীরার অনুরূপ

র‍্যাটক্লিফ রোয়েদাদে দেশ বিভাগে মালদহ জেলার পাঁচটি থানা পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ভোলাহাট-শিবগঞ্জে ব্যাপক ভাবে গম্ভীরার প্রচলন ছিল তা আমরা প্রথমেই দেখেছি। দেশ বিভাগের পরে সেখানে গম্ভীরা নামটি আছে বটে, কিন্তু রূপ বদলেছে। সেখানে শিব ইত্যাদি চরিত্র নেই। 'নানা' কথাটির মধ্যে মুসলিম গন্ধ সন্দেহ নেই, গম্ভীরার শিবকে স্মৃতিতে রেখে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি হিসেবে 'নানা' সম্বোধন করে থাকে মুসলিম গম্ভীরা কবিরা এখানে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে গম্ভীরার জনপ্রিয়তা লোকসমাজের নিকট ব্যাপক বলে মূলতঃ হিন্দু চরিত্রটি মুসলিম চরিত্রে রূপান্তরিত করেছে। আসলে অনুদার মনোবৃত্তিই এই চরিত্রটিকে দাড় করিয়েছে।

'নানা' মালদহে শিব, কিন্তু পূর্ববঙ্গে গ্রামের এক বর্ষীয়ান চাষী বা মোড়ল। এই নানার চাপদাঁড়ি আছে, নানা (পিতামহ) ও তার লাতিন (নাতি বা পৌত্র) এই দুটি চরিত্র সেখানে স্থান পায়। 'ডুয়েট' জাতীয় এই লোকনাট্য। নানা ও তার নাতির সংলাপের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের অবস্থা বিবৃত হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরসভা, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি থাকে। মালদহ অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ সেখানে অনুপস্থিত। রাজসাহী রেডিও কেন্দ্র থেকে গম্ভীরা ওয়াহেদ রহমানের পরিচালনায় বহুদিন প্রচারিত হয়ে এসেছে। ইংরেজ বাজার থেকে আগত মোহাম্মদ সোলেমান রোহনপুরের উল্লেখযোগ্য কবি।

বিভিন্ন চরিত্রের প্রবেশ পূর্ববঙ্গের গম্ভীরায় হয়নি বলে তার মনোরঞ্জনের ক্ষমতা বা নাট্টিক ক্ষমতা গৌড়বঙ্গের মালদহের গম্ভীরা থেকে অনেক কম একথা স্বীকার করতেই হয়।

● গম্ভীরা গানের ক্ষুদ্র সংকলন ●

একেবারে হাল আমলের গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তুর মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সামাজিক অনাচার-অত্যাচারও স্থান পেয়েছে।

এর মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রসঙ্গে, লাভম্যারেজ করা মেয়ের সঙ্গে মায়ের বাক্‌যুদ্ধ, বেকাব স্বামী ও রোজগেরে স্ত্রীর সংলাপ, আসামের দাঙ্গা-হাঙ্গামাও যেমন আছে তেমনি আছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি, পঞ্চায়েত শাসন-ব্যবস্থা, যুক্তফ্রণ্টেব শাসনব্যবস্থা, ইরাণ-ইরাক যুদ্ধ, রাশিয়া, চীন, আমেরিকার যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়, দেশের আইন শৃঙ্খলা ও নির্বাচন প্রভৃতি প্রসঙ্গ।

শিববন্দনা / হরিমোহন কুণ্ডু

(তাঁতীরূপে শিব)

(ওহে হর)

তুমি এই ভবেতে তাঁত বুনা কাজ
খুব ভালই জান।
ব্রহ্মাণ্ডের একদিক হতে ফেলে মাকু
আর দিকেতে টান।

১। এ বিশ্ব বিশ শ'য়ের তানা[১]
গাঁথি তাহে বিস্ময় সানা[২]
হর রকমের হরেক বানা[৩]
নিত্যনতুন আন।

২। সৃষ্টি করে মায়ার লরদ[৪]
তাহে জড়িয়া দারাপুত্র গরদ
ঝাঁপ[৫] উঠায়ে পরদ পরদ
আচ্ছা ঝুটা বন।

৩। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় করা,
তোমার পক্ষে মশরা জড়া।[৬]
পাপীগণকে পেলাম করা।[৭]
কাজে ধুতরা ধুন।

৪। এমনি তুমি তাঁতের তাঁতী (তোমার)
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সাঁতের সাঁতী,[৮]
ফুল্‌কী[৯] বাছে[১০] পাতি পাতি
মৃত্যু দপ্তি হান[১০]

৫। তোমার আদ্যাশক্তি বরফ লাটা[১১]
ত্রিগুণ সুতা কাট্‌না কাটা
হরিমোহন বলে তানা হাঁটা
এতই করাও কেন।

এটি একটি আধ্যাত্মিক গান। এর শব্দার্থগুলি দেওয়া হোল। ১. সুতা, ২. ছিদ্র, যার মধ্য দিয়ে সুতো প্রবেশ করে। ৩. সরুখিল ৪. গোল

একখানা কাষ্টখণ্ড যাতে কাপড় বা সুতো জড়ায়, ৫, যার উপর পা দিয়ে চাপ দেওয়া হয়, ৬. ছিন্ন সুতোকে জোড়া দেওয়ার নাম, ৭. মোলায়েম করা ৮. সাথের সাথী, ৯. উদ্বৃত্ত সুতো ১০. বেছে ১০. সানার উপব নীচের কাঠ, ১১. লাটাই, যাতে সুতো জড়ান থাকে।

গান / গোপাল দাস

(এদেশে গ্রামফোন চালু প্রসঙ্গে)

এখান হতে পালিয়ে চল সবাই।
দুশমন ঘুরছে পিছে পিছে, কলে ভরবে ভাই।

১। বাইচাঁদ বড়াল আদি করে বড বড় ভাইরে ধরে,
রেখেছ ভাই বন্ধ করে, কলেতে ভরে,
আবার রেখেছ এক মেয়েকে ধরে
তার নাম গহরজন বাঈ।

২। সেতারের ঝনঝনি, বেহালার কুনকুনি।
মন্দিরার টুনটুনি, স্পষ্ট শোনা যায়।
কেমন কনসার্ট পার্টি, তবলার চাঁটি কলেতে বাজায়।

৩। যাত্রা থিয়েটার কীর্ত্তনাঙ্গ, সকলকেই করেছ সাঙ্গ
কলের মধ্যে সবাই বন্ধ, কাউকেও ছাড়ে নাই।
(কেবল) বাকীর মধ্যে আছে যারা গম্ভীরা গায়।।

৪। (কলের) চেহারা দেখে পিলাই কাঁপে।
লিয়ে বেড়াই চুপে চাপে।
একলা দোকলা ফেলে তাকে
ছাড়াছাড়ি নাই।
আমাদেরকেও ধরবার জন্য গম্ভীরায় বেড়ায়।।

৫। ধনদৌলত, টাকাকড়ি, জুড়ি, ঘোড়া, ঘর-বাড়ী,
কলেতে গিয়াছে সব বাকী কিছু নাই।
এখন কলের গানে মাতিয়ে প্রাণে
ন্যাংটা করতে চায়।।

৬।　　সুশিক্ষিত মহাত্মারা, কলের গানে আত্মহারা,
বিলাস পূরণে তারা কলের গান আনায়,
ঘরের পয়সা যায় ভাই খস্যা,* দিশা কর ভাই।

৭।　　দাস গোপাল ভেবে বলে কলের গান চালিত হলে
দেশের বিদ্যা গান বাদ্য যাবে ভাই ভুলে।
(এখন) দেশের মাল সব হচ্ছে পয়মাল
সামাল করা চাই।

রিপোর্ট / মোহাম্মদ সূফী

(এর পটভূমিকায় আছে ১৩৪৫ সালের মালদহের বন্যা)

চাচা জান বাঁচা দায় হলো বানে শহর যায় ভাযস্যা।
কত উকিল মোক্তার হাকিম ডাক্তার হাগ্ছে দুয়ারে বইস্যা।
ক্ষীরোদ সাহা, মহেন্দ্র শেঠে[১] বাঁধলো বান বালুরঘাটে।[২]
বাঁধ ভ্যাঙ্গ্যা ঢুকল বান, একজিবিশনের মাঠে।
মাঠে হুক্কা[৩] ভাসে, দেখে পোষ্টমাষ্টার হাসে।।
আবার কালী সাহা[৪] করে আহা ব্যাঙ্কের পাঁচিল যায় ধ্বস্যা
খাঁ সাহেবের[৫] রাব[৬] গুড়ের টিন, জলে ডুবেছিল তিনদিন,
দিশা প্যায়্যা উঠায় গিয়া মাছিতে ভিন ভিন।
বাবু ছগনলাগ তার নাম, গুড়ের দিচ্ছিলেন তিনি দাম।
তোমরা খ্যায্যা ছ্যাপো সবাই ল্যাগবে না পয়সা।
উপেনবাবু[৭] পড়ে পাঁকে, লালবাবু বিহারী[৮] বাবুকে ডাকে
গঙ্গাদেবীর পূজা কর শীঘ্রি ঢোল ঢাকে।
আবার রাখালবাবু[৯] পাম্প্শু অ্যালবার্ট
বাটাকোম্পানীর মত ঠাট।
ও তার ঘরের মধ্যে ঝুলছিলো আলনাতে হ্যাট-সার্ট।
সে সব টকি হ'লে[১০] আম গাছেরই তলে।
তোমরা হেসো না কো লেগে ঢেউ হয়েছি কি দশা।।

রোহিণীবাবুর[১১] মটর ভাসে মুরারী সাউজী[১২] দেখে হাসে।
মনমোহন সাহা তাড়াতাড়ি যায় নৌকার তল্লাসে।
নৌকা না পেয়ে শেষে টিনের বোট বানাতে বসে ॥
আবার সদর গেটে বেন্ধে রাখে দড়িতে কস্থা।
আশুবাবুর[১৩] কপাল মন্দ রথবাড়ীর পুকুর করলো বন্ধ ॥
মাছ পালালো গৌদরাইলে[১৪] নাই তাতে সন্দেহ।
এ সব শুনে হৈ চৈ তাড়াতাড়ি গেলাম লাঙ্গলবাবুর[১৫] বাড়ী ॥
ও তার ডুবেনি ঘর কেবল পায়খানার রস্থা[১৬]

১. বন্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ক্ষীরোদ সাহা ও মহেন্দ্র শেঠ দুজনে নিজেদের খরচায় বাড়ীর সামনে বাঁধ বেঁধেছিলেন ২. বালুচর বলে জায়গা ৩. হুঁকা ৪. তৎকালের একজন প্রতিষ্ঠিত উকিল ৫. মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ৬. ময়লা ৭. তৎকালের উকিল ৮. গৌড়দূত প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক লালবিহারী মজুমদার—প্রাক্তন কমিশনার ৯. হেল্থ অফিসার ১০, লছমী ঘর নামে প্রেক্ষাগৃহ ১১, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ১২, রোহিণীবাবুর ভাই ১৩, জমিদার আশুতোষ চৌধুরী ১৩, বিখ্যাত বাঁধ ১৪, জোহুর আমেদ চৌধুরী জেলাপরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন শেরশাহী বাদিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। বাদিয়ারা মুখ্যতঃ কৃষক, তাই তুচ্ছার্থে তাঁকে লাঙ্গলবাবু বলা হয়েছে। ১৬. ভিজা।

ডুয়েট / সেখ সোলেমান

(ছেলের বাবা ও মেয়ের বাবা)

১

(ছেলের বাবা)

আগে সামলা নিজের বাড়ী
দিস্ পরেরি দোষ, হয়ে বেহোঁস[১]
মেয়ে রেখে ধাড়ী ॥

১

মেয়েরি গুণ, কানা বেগুন
জেনেও তার মাতা।

ঘরে বসে আটা পিসে
হয়ে ঢেঁকি যাঁতা।
কেউ বলতে গেলে, ভাজা তেলে
তারি ভাঙ্গে হাঁড়ি ।।

২

সোনার চুড়ি হাতে ঘড়ি
চশমা এঁটে।
খোপারি চুল, জড়িয়ে ফুল
বাঁধে ঢেউ কেটে।
ও ঘুরে মতলব করে, ফ্যাসান ধরে
ও পরে মার্কা মারা শাড়ী ।।

৩

টকি দেখে, নাচ গান শিখে
আরও কত কি
প্রাণ ঢেলে কাঁদে ফেলে
খায় মাখন ঘি
বেড়ায় নৌকায় চড়ে, গুণ ধরে
সমুদ্রে দেয় পাড়ি ।।

(মেয়ের বাবা)

যাই তোর কথার বলিহারী
সাফাই ঝেড়ে, মাথা নেড়ে
দেখাও দোষ আমারি ।।

১

ছেলেরা আজ পেয়ে স্বরাজ
সেজে ধর্মা ষাঁড়।
সাধু বেশে ঘরে এসে
খুঁজে মধুর ভাঁড়।
খেলে তাস-পাশা, লয়ে আশা
করে আড্ডা জারি ।।

২

মাসি পিসি, বেহুঁশ যার খুশি

সম্বন্ধ পেতে

আসে যায়, শুয়ে খায়

রঙ্গেতে মেতে।

চলে উজান ভাটা, ভুলে ঘাটা[২]

সেজে ব্রহ্মচারী ।।

৩

লেখা পড়া, বিয়ে করা

শিকাতে তুলে

উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, চাঁদের ফাঁকে

ফুটন্ত ফুলে

ঘুরে বিলাসিতায়, চরম মাত্রায়

হয়ে বেরোজ গাড়ী

১, বেহুঁশ ২, পথ

শিব-বন্দনা / সতীশচন্দ্র গুপ্ত

ঐ দ্যাখ্‌ ন্যাংটা বুড়া সঙটা[১] সাজ্যা ঢঙটা কোর‍্যা আছে বোস্যা[২]
বুড়া আস্ত খ্যাপ্যা ভষ্‌ম ল্যাপা বাঘের ছালটা পড়ছে খোস্যা॥ আছে বোস্যা।

১. বুড়া ষাঁড়ে চোড়্যা এ্যালো দোর‍্যা গম্ভীরাতে পূজা ঘ্যাতে।
ঐ দ্যাখ লদবোদ্যা[৩] ঐ বাঁগুয়া[৪] বলদ আসছেরে ভাই ক্যামন শুঁয়্যা।
আছে বোস্যা।

২. বুড়ার মাথায় ল্যাপটা আলাদ[৫] ভ্যাঁপটা[৬] জটে সাঁপটা ফোঁস ফোঁসাছে।
আবার মাইয়া একটা তাইয়া কেমন, ঢেউ খ্যালাছে আছে রোস্যা[৭]॥
আছে বস্যা।

৩. ধুৎতেরি ধুতরার ফুল কি সখ কোর‍্যা কেউ দ্যায়রে কানে।

(আবার) হরদম মুখে বম্‌ বম বুলি 'ভিক্ষার ঝুঁলি কাঁধে কোস্থা ॥
আছে বোম্বা।

৪. আবার ভোঁ ভোঁ ভরং ভরং শিঙ্গা ডুমরু বাজাছে বোম্বা।
ঐ দ্যাখ বোমকেশ জটাজুট জালে আকাশে যেন পড়ছে হ্যাঁইস্থা ॥ আছে বোস্থা।

৫. আবার কপাল ফুট্যা, আগুন ছুট্যা, সারা দুনিয়া করছে আলা।
গাঁজায় দম কি দিচ্ছেরে কম, কলকির ধুঁয়াফেলছে চুস্থা। আছে বোস্থা ॥

৬. ঐ দ্যাখ দুদিকে দুটা হুলুকমুখা [৮] সিদ্ধি ঘুটছে তালে তালে।
আবার পালে পালে কুচনী-বুচনী, [৯] ভাঙ্গ-ধুতরা খাওয়ায় ঘোঁস্থা ॥
আছে বোস্থা।

৭. দ্যাখেক ঝলর-মলর ঝুলছে ভাস, হাড়ের-মালা ভরা গলা।
বুঢ়া তাল বেতালে নৃত্য করে রামনামে হোয়্যা বোহুঁস্থা ॥ আছে বোস্থা

৮. ভেবে সতীশ বলে পদতলে, ভক্তি বলে জুড়েক আসন।
বুঢ়ার এমনি শাসন, যমের ভাষণ আসে না এখানে পোস্থা [১০] ॥
আছে বোস্থা

---

১ অপরূপ বেশে ২. বসে, ৩. মোটাসোটা ৪. বাহন ৫. বিষধর সাপ ৬. হাতে পায়ে জড়ানো সাপ; স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা ৭. জোরে ৮. বিচিত্র মুখভঙ্গী বিশিষ্ট, ৯. সাঙ্গ-পাঙ্গ, ১০ ঢুকতে।

ডুয়েট / গোবিন্দলাল শেঠ

(ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রথম পাশপোর্ট প্রবর্তনে)

মিঞা / বিবিজান, বিবিজান ওরে মেরি জান
ছমাস থেক্যা তোকে না দেখ্যা
ধরে না হামার প্রাণ।

৷

মিঞা / পাঠিয়া দিয়্যা পাকিস্তানে তোকে
বিবি / একলা বেশ ছিল্যা তো মনের স্থখে

মিঞা / কেন অভিমান করিস মিছে আর
বিবি / এত দেরী কেন আসতে তোমার
মিঞা / তুই পারবিনা বুঝতে-পাশপোট করতে
(হয়েছি) হালাকান কত পেরেশান'[১]।

২

মিঞা / কই নাস্তা[২] পানি চা লিয়া আন
বিবি / আনবো কি ? এখানে বড় চিনির টান
মিঞা / পাশের ভারত ছেড়ে দিয়া পাকিস্তান
বিবি / সুদূর কিউবা থেক্যে চিনি আনান
মিঞা / তুই চিনির চাযে মিঠা আহলাদেব টী-টা
(তুই) চোখের মণি আমাব আশমানের চান [৩]।

৩

বিবি / কই দেখাও তোমাব পাশপোট।
মিঞা / এই ছ্যাখ কেমন সুন্দব তুলেছি ফটোক
মিঞা / তারপর পাকিস্তানেব খবর কেমন ?
বিবি / সিন্ধী, পাঞ্জাবীদেব হাতেই শাসন
মিঞা / কেন বাঙালী যে বেশী সংখ্যায়
বিবি / গুতাগুতি সদাই গদিব আশায়
আববী হবফে লেখ বাংলা ভাষা
(এখানে) পচ্ছ্যাদেব[৪] আঁকাবী[৫] বিধান।

৪

মিঞা / চল, দুজনে দেখবো আজ ছবি
বিবি / দেখবো কি, সবই যে উর্দ্দু আর আববী
মিঞা / উর্দ্দু বই তো রসে ভরা
বিবি / আছে নূরজাহান, সুলতানা, আনোয়ারা
মিঞা / এরা সবাই নীচে সুরাইয়ার কাছে
(হামাদের) মারিয়া রেখ্যাছে হিন্দুস্তান।

৫

মিঞা / এই পাশপোট আর ভিসার ঠ্যালা
বিবি / অনেকের মোদের মত বিরহ জ্বালা

মিঞা / কি ভারত কি পাকিস্তান বাসী
বিবি / মুটে মজুর মধ্যবিত্ত চাষী
মিঞা / এই পাশপোট তাদের হয়েছে বিষফোট[৬]
(সকলে) চাই অচিরে এর অবসান।

১. ক্লান্ত ২. জলখাবার ৩. চাঁদ ৪. পশ্চিমাদের অর্থাৎ হিন্দুস্থানীদের ৫. জবরদস্তি ৬. বিষফোঁড়া

খাদ্যমন্ত্রীর নিকট গান / সেখ সোলেমান

দেখাস কাছুয়ার[১] মত, ডাঘঘা[২] চোখ
ভাতিয়ার[৩] বনে হাতিয়া জোঁক[৪]
মুলুক শুধ্যা জিনিস হলো টান
মোদের ঠইগ্যা[৫] মুইস্যা[৬]
মঞ্চে বইসা মুখে কুটে ধান[৭]
১। দিনরাত খাইটা প্যাটে জুটে না ভাত
আর পরণেতে কাপড় দশ হাত
হায় উপাই কিবা করি
চিন্তায় চিন্তায় সবাই মরি
ছিল সাচ্চা যত সব নেতা ভূক্তান[৮]
২। কেউ ব্ল্যাক মারকেটে লুটে কোটী হাজার
কণ্ট্রোল করে খুলে চোরা বাজার
আর কেউ দু চার টাকার তরে
কত গরিবেরি ঘরে
গলায় ফাঁসি দিয়ে হারাই নিজের জান
৩। খাবার তরে করলে, চেঁচামেচি
দেখায়ে তখন আইনের ক্ষুর কেঁচি
মোদের ধইরা মাথামুরে
পিটাই বৃথা জেলে ভরে

৪

কি বলবো হায়, আখারি ছাই
পুরুষদেরি খাঁচা
মোদের ভেবে বোকা দিয়ে ধোঁকা
নাচায় ভালুক নাচা।
নিজেরি দোস, পইরা মুখোশ
উইড্যা ঝাঁকে ঝাঁকে।
শুধু চালে, বিনাজালে
রুই কাতল ছাঁকে।
ও সেজে ঢোঁরা সাঁপরে
দিনরাত করে পাপ রে।
ও সুযোগ পেলে, প্রাণ ঢেলে
ফাঁকি দিয়া মন জুড়ায়

১. কচ্ছপ ২. বড় ৩. একটি বিখ্যাত বিল ৪. একধরনের অতিকায় জোঁক ৫. ঠকিয়ে ৬. মুছে ৭. বড বড় কথা ৮. শেষ, অবশিষ্ট ৯

আমের গান / বিশ্বনাথ পণ্ডিত

(দুই আম বিক্রেতা-একজন ছেলে, অন্যজন মেয়ে)

(ডুয়েট)

মেয়ে / বাবু বলি তোমার কাছে, ওধারে যেও পাছে
এখানেও আছে, নামকরা আম।
(তুমি) লাওনা দেখ্যা শুন্যা
নিজের হাতে গুন্যা
একটাও পাবা না খুঁজ্যা, সরা পঁচা
(=একেবারে পচা) আম

ছেলে /　　বাবু বড় কষ্ট কইরা, গাছের ওপর চইর‍্যা
এন্যাছি পাইর‍্যা, মালদইয়া আম।

(তুমি) লাওনা না লাও, চাইখা দেইখা যাও
একে একে শুনাই কত রকম নাম।
ক্ষীরমোহন, মতিঝুরণ, দিলসাজ, ক্ষিরসাপাতি,
বৃন্দাবনী, গোপালভোগ, দুধিয়া, ভারতী,
লোহজং, বেগমবাহারা, দুধকুমোর, কুয়াপাহাড়া,
আরাজনা, মিছরিকন, সুরমাফজলী, ঘি কাঞ্চণ,
মোহনভোগ, লম্বাভাদুরা, চক্চকা, গুঁটিসিন্দুরা,
বেলুয়া, কেলুয়া, আক্লুমাটি,
জালিবান্ধা, হিল্সাপেটি,
সীতাভোগ, বদনাসোনারা,
রামপসিন, জিলাপিক্যারা,
বোম্বাই, সব্জা, শৌল্ঢুক্কা,
রুহিমুণ্ডা, চোঙা, হুক্কা,
কালাপাহাড়, মুনিয়া　　দিলবাহার, ফুনিয়া,
তোতামুখি,　　শিয়ালখাউকি,
ল্যাংড়া, গোলাপজাম ॥ ধুয়া]

খুটারিয়া, ধোকরিয়া, নাকুয়া, তাবাক্বুসন
করলাদাগি, কিষাণভোগ, গোলাপখাস, তালকুন,
মণিকাঞ্চন, কাঁচামিঠা, কুমড়াজালি, রসুনপাতা
চিনিচাম্পা, মোহনবাঁশি, কাল্যাদাগী, বারোমাসি
জামানিয়া, সাওনিয়া, কাউয়াডিম্বি, মণ্ডানিয়া
আশ্বিনা, কর্মা, মধুচুসকি
গিধ্নী হাগ্গা, পানিলটকি
রাখালভোগ, জুহুরিয়া
নবাব পসিন, কপুরিয়া
অমৃতভোগ, কোহিতুর
গৌড়জিতি, মোতিচুর

হিমসাগর, চোরসা, রঙবাহার, বাতাস
চিড়াভিজা, কোসাকাঞ্চন,

লখ্না, পত্তিরাম, (ধুম্মা)

গান / ইন্দ্রদমন শেঠ

(বাংলা দেশের অধঃপতনেব পবিপ্রেক্ষিতে)

হায়রে স্বাধীনতার ধারা। হায়রে স্বাধীনতার ধারা।
এখন ভাঙ্গ্যা চুর্যা[১] উব্যা পর্যা কুনদিকে হবে খাড়া॥

১. হিন্দু মোসলেম জৈন খ্রিষ্টান এক দরজা সব হল।
দেখতে দেখতে কলির কাণ্ড ঘোর কলিতে পোল,
ওরি মধ্যে থাক্যা পূর্ব-পশ্চিম বঙ্গ হল সাবা॥

২. বাঙালী আব নয় বাঙালী অবাঙালী নেতা,
তাদের চাপে, হাপে দাপে থুংনী খাঁতা,
পূব-পশ্চিম বাঙালী এখন জিন্দাতে আধমবা॥

৩. পূব-পশ্চিম বাঙ্গালী মিল্যা স্বরাজ আনলে মোর্যা।
হায়রে সে বাঙালী এখন সওং[২] হাত জলের তলে পোর্যা
আবার অবাঙালী বাঙালীকে করলি লস্সি গাড়ী॥

৪. বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান বিজ্ঞানে দুনিয়াৎ ছিল সেরা
এখন সেই বাঙালী ঘোর কাঙালী ব্যাড়া জালে ঘেরা,
চাকরী চাকরী কোর্যা পায়ে ধোর্যা হচ্ছে আত্মহারা॥

৫. কোথায় সুরেন, চিত্তরঞ্জন, কোথায় বঙ্কিম, রবি
ওরে ক্ষুদি আদি শহীদেরা আর আর বঙ্গের ছবি
তোদের ধমণীতে তাদের রক্ত ছায়না কিরে সাড়া॥

৬. জাগ বাঙালী ছাড় বাঙালী উঠ্যা কাচ্চি পাকি।
ওরে বঙ্গভঙ্গ এক হোয়ে যাক, রেখে ধর্মসাক্ষী
নইলে বাঙালীর স্থান নাই, ভারতে হলি ছন্নছাড়া॥

৭. আত্মতত্ত্ব ভুলে মত্ত চাকর‍্যা বাবু সাজ্যা
বাঙালী বাঙালী ধোর‍্যা ঘুসে খাচ্ছিস্ ভাজ্যা,
যদি বাঁচবার মত বাঁচতে চাসতো ধরেক ন্যায়ের খাঁড়া ।।

৮. তোরাই একদিন ভাসিয়্যাছিলি সাত সাগরে ডিঙা
রূপ-সনাতন হাজির করলে তোদেরই এক হিঙ্গা
স্বর্ণবঙ্গে ধর্মপ্রচার কর‍্যাছিল কারা ।।

৯. তোরাই ভারত ভাগ্যাকাশে দীপ্ত দিনমণি
স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমে তোরাই স্বর্ণখনি,
তোরা বাপের ছেলে দাপে চলেক, আবার উঠ্যা দাঁড়া ।।

১০. জাত খোয়ালি ভালই করলি, বুদ্ধিশুদ্ধি কোর‍্যা
নারী জাগরণের যুগে, যাবি বাঁটি তোর‍্যা
এখন ভক্তির চোখে দ্যাখেক শক্তি
মুক্তি আনবে যারা
হায়রে স্বাধীনতার ধারা ।।

১. ভেঙ্গে চুরে ২. সওয়া

বন্দনা / উপেন্দ্রনাথ দাস

দেখ দেখ চোখ খুলে হে মৃত্যুঞ্জয়
ভারত গগনে দুষ্ট গ্রহের উদয় ।
মোদের সোনার ভারত, হল গারদ
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ।।

১। গ্রহ ফেরে ভারত ছেড়ে, ইংরেজ গেল সাগর পার ।।
তার পরে দিলে ছেড়ে, তোমার জোড়া ষাঁড় হে ,
তছরূপ পয়মাল করলো কত, বেপরোয়া মনের মত ।
শেষে খেয়ে লাঠি লাদনা[১] দামড়া হ'ল কোমর ভাঙা
তবু স্বভাব দোষে, বসে বসে, করছে কত অভিনয় ।।

২। বড় সাধের স্বাধীনতা, রথ চালালে দেশে
গরীব দুখী দল সারা হল। চাকার তলে পিষে হে।
ধনীর ধনে ডাকলে বান, স্বার্থেই ডিঙা বইছে উজান
হত সব সাধু ব্রহ্মচারী, জুটে টানছে রথের দরি[২]
ছিনু পরাধীন. সুখে গেছে দিন
এখন স্বাধীনতার ফল বিষময় ।।

৩। গণতন্ত্রের আসল রূপটা, বেশ উঠেছে ফুটে
মারামারি কাটাকাটি, নারীর ধরম লুটে হে
ঘুষ, ঘেরাও, গুণ্ডাবাজী, হরতাল, ইলেকট্রিক, পুলিশ লাঠি
গ্যাস গুলি আর বোমা, এ সব রাম রাজত্বের গয়না
দেশ ধ্বংসলীলা চলছে খোলা পথে লাগছে ভয়।

৪। ব্যস্ত সবাই গদির লাগি, কাজের বেলায় মান্দা[৪]
গেল উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, দোষী লাল ঝাণ্ডা হে।
গরু মেরে জুতো করে দান, গদিওয়ালারা এমনি শয়তান।
ওরা মুখে যেটা বলে, কাজে উল্টা ঠিক তার চলে
তাই আজ হিংসার আগুন, জ্বলছে দ্বিগুণ
ছড়িয়ে গেছে দেশময়।

৫। যেথা মাটির তলে, সোনা মিলে, সাগর তলে হীরা
সোনার ভারত নামটি যাহার, আছে জগৎ জোড়া হে।
সেথায় লোকে মরছে ভুখা, খাবার জোগায় আমেরিকা
অন্নপূর্ণা যাদের ঘরে, তাদের ঝোলা কেন ঘাড়ে।
সাজিয়ে বোকা আমেরিকা, তোমার বুদ্ধির গোড়ায় ঢালছে ছাই ।।

৬। দেশটা জুড়ে হেট উপড়ে, চলছে দলাদলি
সভ্য মানুষ দিয়াছে আজ, মানবতার বলি হে
আনতে শান্তি বাঁচাতে দেশ, জাগো একবার ভোলা মহেশ,
যেমন হয়ে সতী হারা, দক্ষের যজ্ঞ করলে সারা
কর দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, দাস উপেন আজ ভেবে কয় ।।

১. মোটা লাঠি ২. দড়ি ৩. ধর্ম ৪, কম

সিনেমার কুফল / গোপীনাথ শেঠ

(ভরাডুবি ও নিমবেগুন পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক-সম্পাদিকার কলহ)

সম্পাদক / তোমাদের জোগাতে ফ্যাসান, পুরুষ হালাকান[১]
পয়সা কোথায় পায় ?
রকমারি ব্লাউজ সাড়ী কত কিনতে পারা যায় ?

সম্পাদিকা / মোদের ফ্যাসান কিবা আর
নিজের দিকে তাকাও একবার
যার ঘরে চড়ে না হাঁড়ি, তার সুটের কি বাহার !
বাবুয়ানি তার শোভে কি যার ঘরে গুয়্যা চাঁদ দেখা যায়।

সম্পাদক / লিপষ্টিকে ঠোঁট কর‍্যাছ রাঙা
দুই চোখে দিয়্যাছ সুরমা
সিন্যা চ্যাড়া[২] বেড়াও ঘুর‍্যা কি হাঁটার ভঙ্গিমা,
আহা কি হাঁটার ভঙ্গিমা !
বন্ধুর সাথে বেড়াও পথে অপ্সরী কিন্নরী প্রায়।

সম্পাদিকা / মুখে সিগারেট চারমিনার
চোখে চশমা জিরো পাওয়ার
ইংরেজী বাংলা লেকচারে গ্রাজুয়েট মনে হার
নাম সইতে[৩] কলম ভাঙ্গে, পকেটে রঙ-বেরঙ
পেন থাকা চায়।
সাজে কোজে নবাব নাতি ঘরে শিয়াল ঢুকে কুকুর পালায়।

সম্পাদক / ফ্যাসানের সীমা সংখ্যা নাই
সিনেমার সাথে ফ্যাসানও বদলায়
ব্লাউজ, সাড়ী, ইয়ারিং, চুড়ি, জুতাও বদলে যায়
সাজে কোজে ডান্সের পোজে সুচিত্রা সেন হতে চায়।

উভয়ে / সিনেমার যৌন আবেদন
সমাজে ঘটায় অঘটন
ছেলেমেয়েদের চরিত্রের তাই দেখি অধঃপতন

এ প্রলোভন, না হলে দমন

(দেশের) ভবিষ্যৎ কি হবে হায়!

১, পরিশ্রান্ত ২, বুক ফুলিয়ে ৩, সই করতে

চার-ইয়ারী / রামকিঙ্কর পণ্ডিত

(ক)

১। ইন্দিরা গান্ধী—করে বাংলাদেশের মুক্তি, নিজের চুক্তি, যুক্তি সারে
(ভারতের প্রধানমন্ত্রী) করেছি নিজে কাজ

২। মুজিবর রহমান—বাংলাদেশ ভুলবেনা তোমায়, থাকতে বাংলা সমাজ।
(বাংলা দেশের প্রধান মন্ত্রী)

৩। জুলফিকার আলি ভুট্টো—আমি লড়ে দেখব একবার,
(পাকিস্তানেব প্রধান মন্ত্রী) কবতে প্রতিকার

৪। উচিৎ বক্তা—সেই দুধে দই জমবে না আর
খেলে খাওয়া হবে তোমার সার
যতই লাফান ঝাপান, আর তরপান
সব হয়ে গেল বেকার ॥

(খ)

১। যত রকম সাহায্য দেবার, যা হয় দরকার, দিয়ে যাব তার
হবে না কোন আন।

২। থাকতে জীবন রাখবে বাংলা তোমারই সম্মান।

৩। সহায় চীন, আমেরিকা—ভয়ের কারণ নাই

৪। সেই গুড়ে বালি পড়েছে ভাই
বন্ধুরা সব হবে না সহায়—
ভিয়েতনামের মুক্তি আমেরিকা দিল
পড়ে দেখ সবার ঠেলায়।

১। বিশ্বের সকল দেশ মিলে, স্বীকৃতি দিলে, মেনে নিলে সবাই
বাংলা দেশের বিধান।

২। নির্বাচনই দেখিয়ে দেবে এর সঠিক প্রমাণ।

৩ সৈন্যদল না হলে ফেরান, স্বীকৃতি দিবে না পাকিস্তান

৪। পাকিস্তান ধুয়ে মুছে হবে সাবাড়, চারদিক ঘিরে ভাঙবে তোমার ঘাড়
দেখ সীমান্ত গান্ধী, বেলুচিরা, করে দেবে প্রতিকার ॥

বিশিষ্ট সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
৩	৬	K· Chh-mondal	Kochh-mondal
৮	১৭	জোতগঞ্জ	জোতগজজ
২২	১১	আগে······নেই	এখন কেবলমাত্র বরিন্দ এলাকার কোন কোন স্থানে প্রচলিত।
২৭	foot-note	(paper)	Paper read in the Seminar on The Early Historical perspectives of North-Bengal under the anspices of the University of North Bengal.
৪৭	২৫	ঈষদুন্তিভিন্ন	ঈষদুন্তিন্না
৪৮	২৬	ধাপা	টাপা
৯৪	১২	তার লাতিন	তার লাতিন বা পোতা
১০০	১৬	বিখ্যাত বাঁধ	বিখ্যাত বিল

স্বরলিপি

(একটি বন্দনা গানের কিছু অংশের স্বরলিপি দেওয়া হল)

কথা ও সুর / গোপীনাথ শেঠ * স্বরলিপি / অরুণকান্তি দত্ত *

দেব মহাদেব মহাকাল
ভারত তরণীর ধরবে কেবা হাল
কাণ্ডারী বিনে এই তুফানে তরণী যে বেসামাল।

১. গণতন্ত্রী, ধনতন্ত্রী, দলতন্ত্রী
গান্ধীবাদী, সাম্যবাদী, স্বতন্ত্র দলে
দেশ সেবার কম্‌পিটিশনে চলে
সবাই আনবে দেশে রামরাজ
অতিশয় ব্যস্ত তাই কামরাজ
আজ রাম বিহনে সিংহাসনে বসেছে বানরের পাল।

(আকার মাত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত)

II গা মা I পা - । পা । ধা র্সা ণা । ধা পাধা পা । মা রগা রা I
দে ব ম হা ০ দে ০ ব ম ০০ হা কা ০০ ল্

I সা সা সা । রা রা গা । পা পা মা । গা রগা রা I
ভা রত্‌ ত র ণী র ধ র বে কে ০০ বা

I সা -া -া । -া -া পা । পা পা ধাণা । ধা পা -া I
হা ০ ল ০ ০ কান্ ডা রী ০০ বি নে ০

I পা পা পা । ধার্সা র্সা ণা । র্সণা ণা ণা । ধা পাধা পা I
এই ০ তু ফা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা গা । রগা রা রা II

I পা পা মাগা । -া গা মা । পা পা পা । -া পা ধা I
গ ন ০০ ০ ত ন্ত্রী ধ ন ০ ০ ত ন্ত্রী

I র্সা র্সণা ধাগা । া ধা ণা , ধা ণাধা পা । - া - া - া I
দ লo oo o ত ন্ত্রী য ন্তo o o o o

I {পা পা ধা । ধা র্সণা ধা । পা পা ধা । মা পা - া I
গা o ন্ধী বা দী o সা o ম্য বা দী o

(গা গা মা)} পা পা ধা । মা পা - া । গা গা গা । সারা গামা ধপা I
দা দা বে সু বি ধা বা দী o শ ত শ ন্তo oo oo

I গা গা গা । রা গা বা । স। সা বা । ণা সা সা I
কং গ্রেস ক ম্যু o নিষ্ট্ স্ব ত ন্ত্র দ লে o

I সা বা বা । বা গা - া । সা সা বা । ণা সা - া {সা বা I
দে শ সে বাব কম্ o পি টি শন্ চ লে o স বাই

I গা গা মা । গা বা গা । সা সা - া । বা গা - া I
আ ন্ বে দে শে o বাম বাজ o অতি শয o

I সা সা - া । বা ।সা বা ণা সা - া । (গা সা রে)} II
ব্য o স্ত তাই কাম o ব o জ ও স বাই

'আজ বাম বিহনে···বসেছে বানরের পাল' এই অংশ 'কাণ্ডারী বিনে এই তুফানে' অংশের অনুরূপ

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী : বাংলা

আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলার লোকসাহিত্য, প্রথম-ষষ্ঠ খণ্ড

ঐ —বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

ঐ —বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর (১—৪)

ঐ —বাংলার লোকসংস্কৃতি

ঐ —বাংলার লোকনৃত্য—প্রথম খণ্ড

গুরুদাস ভট্টাচার্য —বাংলা কাব্যে শিব

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু —বাংলার লৌকিক দেবতা

নীহাররঞ্জন রায —বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম সং

প্রদ্যোত ঘোষ —গম্ভীরা : লোকসঙ্গীত ও উৎসব / একাল ও সেকাল

ঐ —গৌড়বঙ্গের স্থাপত্য : প্রথম পর্ব

মানিক গাঙ্গুলী —শ্রীধর্মমঙ্গল

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব —তন্ত্রতত্ত্ব

হরিদাস পালিত —আদ্যের গম্ভীরা

গ্রন্থপঞ্জী : ইংরেজী

Berger P. L —The Social Reality of Religion

Bessay M —A pictorial history of magic and supernatural

Bhattacharya Asutosh—Folklore of Bengal

Do —Chhau Dance of Bengal

Do —The sun and serpent lore of Bengal

Bhattacharya Benoytosh—An Introduction to Sadhanmala

Caudwell H —Creative Impulse in Writing and Painting

Caudwell C. —I llusion and reality

Crow W. B. —A history of magic, witchcraft and occultism

Chattopadhaya Aloka—Atisha and Tibet,

Charles Bell—Tibet : Past and present

Collier's Encyclopaedia

Comstock Richard—The Study of Religion and Primitive Religion

Cultural Heritage of India, vol. I.

Dalton E. T. D—Descriptive Ethnology of Bengal

Dasgupta Sashibhusan—An Introduction to Tantric Buddhism,

Do —Obscure Religious cults

Douglas Nik—Tantra Yoga

Dunbar G —The Study of Primitive people

Dutta Gurusaday—The Folk Dances of Bengal

Encyclopedia Americana,

Encyclopaedia Britannica,

Encylopaedia of Religion and Ethics

Encyclopaedia of world Art

Frazer J, G—The Golden Bough (A, E), vol I & II

Do —Totemism and Exogamy

Freud Sigmund—Totem and Taboo,

Gaynor Frank—Dictionary of Mysticism

Ghosh Prodyot—Kalighat pats : Annals and Appraisal

Do —Gambhira : traditional masked Dance of Bengal, Sangeet Natak, vol. 53-54.

Harrison J. E—Ancient Art and Ritual

Kern—Manual of Buddism

Khan Abid Ali—Memoirs of Gaur and Pandua

Krappe Alexandar—The Science of Folklore

Lommel Andreas—Masks : their meaning and Functions

Macdonell A—The Vedic Mythology

Malinowski Bronishaw—Magic, Science, Religion and other Essays

Majumdar R. C (Ed.)—History of Bengal, vol. I

Meria Bihalji Oto—Masks of the World

Neil David—Magic and Mystery in Tibet

Parrinder Geoffrey—Witchcraft

Reley Olive L – Masks and Magic

Risley—The Tribes and Castes of Bengal

Sanyal Charuchandra—The Rajbansis of North Bengal

Stein R. A.—Tibet Civilization

Tucci Giuseppe—Tibet : Land of Snow